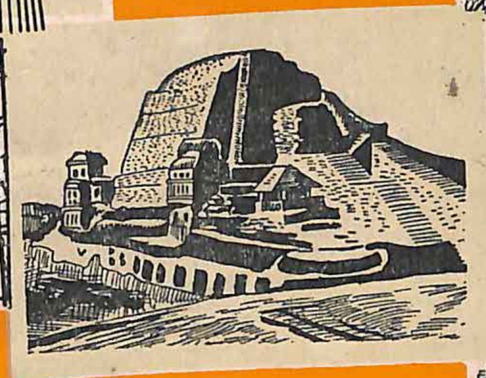
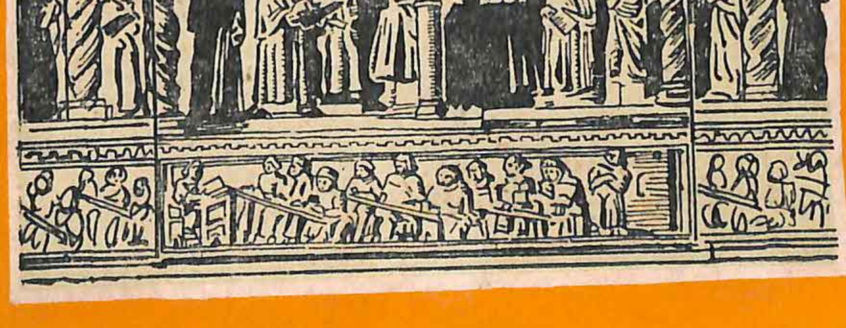
মধ্যযুগের সভ্যতা







Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VII.
'Vide T.B. No. VII/H/81/29 dated 8. 1. 81.

মধ্যযুগের সভ্যতা

(ইতিহাস ঃ সপ্তম শ্রেণী)

ডঃ জহর সেন, এম. এ. পি.-এইচ. ডি,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ডায়মণ্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজ, বহরমপুর
কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর গভর্নমেণ্ট কলেজ, দার্জিলিঙ
গভর্নমেণ্ট কলেজ, বারাসাত গভর্নমেণ্ট কলেজ ও
টাকী গভর্নমেণ্ট কলেজ। 'ইন্দোনেপাল
ট্রেড ইন দি নাইনটিন্থ সেনচুরি,'
'এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন,'
'সভ্যতার ইতিহাস', 'প্রাচীন
যুগ' ইত্যাদি গ্রন্থের
লেখক।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, S. C. Road

বুক হোম
৩২, কলেজ রো কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :

তড়িৎকুমার মজুমদার
বুক হোম
৩২, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 29. 6. 89
Acc. No. 4454

H VII
JAH

প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৭৯
সংশোধিত মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৭৯
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮০
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ১৯৮২

মূল্য : তের টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীতুষারকান্তি বসাক
জলি আর্ট প্রেস
৭/১এ, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জি রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

মধ্যযুগের সভ্যতার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার আলোচনা। এই আলোচনাতে অনেকক্ষেত্রেই বাংলা অক্ষরে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অভিধানের প্রতিশব্দ প্রয়োগ করে ঐসব কথার প্রকৃত অর্থ ও ব্যঞ্জনা বোঝান সম্ভব নয়। শ্রীসুশোভন সরকার তাঁর "ইতিহাসের ধারা" পুস্তিকায় এবং "সমাজ ও ইতিহাস" প্রবন্ধ সংকলনে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের শিক্ষক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এই পাঠ্যপুস্তকে তাঁর অনুসৃত রীতিকে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অনুকরণ করেছি।

চীনা ভাষার লিপি ছবি-ভিত্তিক এবং তার উচ্চারণ, যারা চীনা নয়, তাদের কাছে জটিল। এই কারণে আমরা চীনা উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রদত্ত বানান ব্যবহার করেছি। অতি স্বল্পসংখ্যক চীন বিশেষজ্ঞ বাঙালীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

এই পুস্তকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদ্যোৎসাহী মহলের দৃষ্টি আমি সবিনয়ে আকর্ষণ করতে চাই।

১. পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশানুযায়ী মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস এই পুস্তকে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়, পরধর্মসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও মানবতন্ত্রের চিরস্মরণীয় বাণীগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৩. প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে চিত্রপরিচয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধ্যায়ের শেষে স্মরণীয় তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত অনুশীলনী, পুস্তকের শেষাংশে অতিরিক্ত অনুশীলনী ও বিশেষ অনুশীলনী এবং নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী সব ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনের কথা মনে রেখে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এই পুস্তকের ত্রুটিবিচ্যুতি কেউ যদি আমার গোচরে আনেন বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামত জানান, তাহলে বিশেষ বাধিত হব। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করব। বুক প্রকাশক সংস্থার ঐকান্তিক উদ্যোগ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

জহর সেন

ইতিহাস বিভাগ
আশুতোষ বিলডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

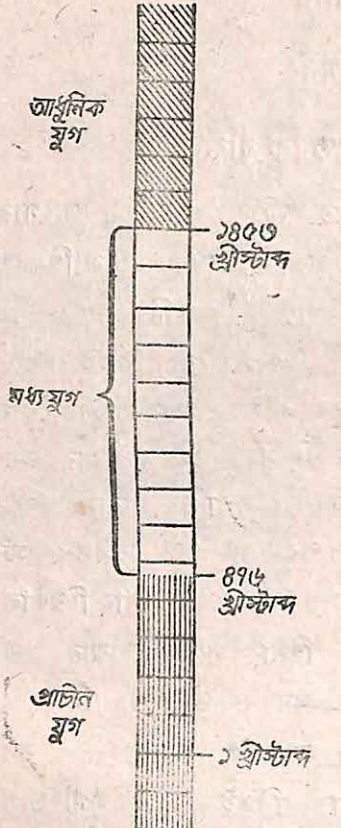
মধ্যযুগ

১. মধ্যযুগ বলিতে কি বুঝি

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবে কোন কোন জায়গার উপর দিয়ে বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি নানা নামের রেখা আঁকা আছে। মানচিত্র থেকে চোখ তুলে এবার বাইরের দিকে তাকাও। এ সব রেখা কিছুই দেখতে পাবে না। কারণ কি? কারণ হল এ সব রেখার সত্যিই কোন অস্তিত্ব নেই। ভুগোলের কিছু কিছু জিনিস সহজে বোঝার জন্য মানুষ এ সব রেখা কল্পনা করে নিয়েছে। রেলগাড়ির জানালা দিয়ে লাইনের ধারে তাকালে দেখবে পর পর শত শত মাইল-পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মাইলপোস্টগুলিও ঐ সব জায়গায় চিরকাল ধরে নিশ্চয়ই ছিল না। দূরত্বের হিসাব সঠিক বোঝার জন্য ঐ মাইলপোস্টগুলি বসানো হয়েছে। সন ও তারিখের হিসাবও তেমনি সময়ের মাইলপোস্ট। প্রাচীন, মধ্য, ও আধুনিক—এ সব যুগবিভাগ মানুষের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগবিভাগ কল্পনা করা হয়েছে। ইতিহাসের নানা ঘটনা সহজে বোঝার জন্য, বোঝানোর জন্য।

মধ্যযুগ বলিতে আমরা কি বুঝি? সহজ উত্তর হল: প্রাচীন যুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরু—এই দুই যুগের মধ্যবর্তী পর্ব হল মধ্যযুগ। ইউরোপের ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনযুগ শেষ হয়েছে মনে করা হয়। রেনেসাঁস বা নবজাগরণকে আধুনিক যুগের শুরু ধরা হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের তারিখ আনুমানিক ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ। নবজাগরণের শুরু পঞ্চদশ শতকে। ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতন হয়েছে। বলা হয় ঐ সময়

থেকেই আধুনিক যুগের শুরু। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ, পঞ্চম শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত, প্রায় এক হাজার বছর ধরে বিস্তৃত।



এই চিত্রে ১ এবং ৩ সংখ্যা দ্বারা প্রথম ও তৃতীয় শতক বোঝানো হয়েছে।

শুধুমাত্র কালের বিচারেই কি মধ্যযুগের পরিচয়? নিশ্চয়ই না। সব যুগেরই একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। মধ্যযুগেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রাচীন যুগের সভ্যতা দাসপ্রথার উপর নির্ভর করে টিকে ছিল। দাসপ্রথা অচল হয়ে গেল বলেই রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। মধ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তি হল সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্র এমন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে এক-জনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দাসপ্রথার অবসানে যখন সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল তখন সমাজে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। শাসন কাঠামো, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানের চর্চা, অর্থনীতি সব কিছুই নতুন আকার নিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. ভারতবর্ষে মধ্যযুগ

ভারতবর্ষে কবে থেকে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছে, তা নিয়ে মত-বিরোধ আছে। কেউ বলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে

মধ্যযুগের আরম্ভ। তাদের মতে পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ। আবার অনেকের ধারণা অষ্টম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের মধ্যযুগ বিস্তৃত।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের লক্ষণগুলি খুবই স্পষ্ট। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি মধ্যযুগেই জন্ম নিয়েছে। আহার ও পোশাকের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগের অনেক অভ্যাস এখনো আমরা মেনে চলি। অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান মধ্যযুগ থেকেই আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মধ্যযুগেই ভারতবর্ষে অনেক বিদেশী শাসক এসেছে। তাদের কেউ হলেন তুর্ক, কেউ বা আফগান, কেউ বা মুঘল। বিদেশী শাসকের সঙ্গে অনেক বিদেশী অনুচরও এসেছে। তারা এদেশে স্থায়ী বসবাস করেছে, এখানকার মানুষের সঙ্গে একান্ত-ভাবে মিশে গেছে। এদেশে তারা অনেক নতুন ধ্যানধারণা, ভাবনা-চিন্তা নিয়ে এসেছে। বিদেশী আগমনের ফলে ভারতের সমাজে কিন্তু কোন ওলটপালট ঘটেনি, আমূল পরিবর্তন আসে নি। তবে পৃথিবীর নানা স্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘটেছে।

৩. মধ্যযুগের সভ্যতার অসম বিকাশ

মানুষ যুগবিভাগ করেছে আপন কল্পনা মত। সুতরাং মধ্যযুগ কবে শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। প্রাচীন যুগের অনেক লক্ষণ মধ্যযুগের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের অনেক লক্ষণ আধুনিক যুগের মধ্যে বেঁচে আছে। তাই নিশ্চিত বলা কখনই সম্ভব নয় মধ্যযুগের শুরু ও শেষ কবে। শুধুমাত্র লক্ষণ বিচার করে যুগ বোঝানো, অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই যুগবিভাগ একান্তই কৃত্রিম। তাছাড়া মধ্যযুগের লক্ষণগুলি সব দেশেই একই সময়ে দেখা দেয়নি। নানা দেশে নানা সময়ে তা প্রকাশ পেয়েছে, নানারূপে সেগুলির বিকাশ ঘটেছে। মধ্যযুগের অসম বিকাশ বলতে

এ কথাটাই বোঝানো হয়েছে। নিচের আলোচনা থেকে কথাটা আরও স্পষ্ট হবে।

ইউরোপে পঞ্চম শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগ। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে অরাজকতা ও হানাহানি চলেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ পর্বে ইউরোপে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটল। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হল। খ্রীস্টধর্মের বাণী মনে নতুন করে সাড়া জাগাল। ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টাও দেখা গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার মধ্যযুগের শেষ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল বলে অনেক শহর সৃষ্টি হল। যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে নতুন এক শ্রেণী জন্ম নিল। প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা আধুনিক যুগেরও লক্ষণ। এইভাবে মধ্যযুগ আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হয়।

ইউরোপে যখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু প্রাচ্যে মধ্যযুগ চলছে। প্রাচ্যে মধ্যযুগে শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বেড়েছে। মেলামেশার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগে আরবরা খুবই সভ্য ছিল। জ্ঞানের রাজ্যে তাদের প্রচুর অবদান ছিল। আরবদের কাছ থেকেই ইউরোপ অনেক জ্ঞানের কথা শিখেছে। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে তাই নবজাগরণ ঘটেছে।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চা বেড়েছে। বিভিন্ন সাধকের চিন্তায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ ৪৭৬ রোম সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীঃ ১৪৫৩ কনস্টানটিনোপলের পতন

অনুশীলনী

১। যুগবিভাগ কল্পনা করা হয়েছে কেন ?

২। মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি ?

৩। ইউরোপে কবে থেকে প্রাচীন যুগ শেষ হয়েছে মনে করা হয় ? কবে থেকে সেখানে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে ?

৪। প্রাচীন যুগের সভ্যতা কোন্ প্রথার উপর নির্ভর করে টিকে ছিল ?

৫। মধ্যযুগের সভ্যতার ভিত্তি কি ছিল ?

৬। সামন্ততন্ত্র মানে কি ? মধ্যযুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৭। ভারতবর্ষে মধ্যযুগ কবে থেকে শুরু ?

৮। ভারতবর্ষে মধ্যযুগের কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ কর।

৯। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

১০। ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমাজে যে সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, তার নাম বল।

১১। প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতায় কি পরিবর্তন এসেছিল ?

১২। প্রাচ্যে মধ্যযুগের সভাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৩। মধ্যযুগের সভ্যতার অসম বিকাশ বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। সন ও তারিখের হিসাবও তেমনি সময়ের — —।

২। প্রাচীন যুগের সভ্যতা — উপর নির্ভর করে টিকে ছিল।

৩। মধ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তি হল —।

৪। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা — অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫। বিদেশী আগমনের ফলে ভারতের সমাজে কিন্তু কোন — ঘটেনি, — পরিবর্তন আসেনি।

৬। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই যুগবিভাগ একান্ত —।

৭। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল বলে অনেক—সৃষ্টি হল।

৮। — সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হল।

৯। মধ্যযুগে আরবরা খুবই — ছিল।

১০। — কাছ থেকেই ইউরোপ অনেক জ্ঞানের কথা শিখেছে।

১১। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ —হয়েছে।

১২। বিভিন্ন সাধকের চিন্তায়—বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

১. জারমান উপজাতিদের আদি বাসস্থান

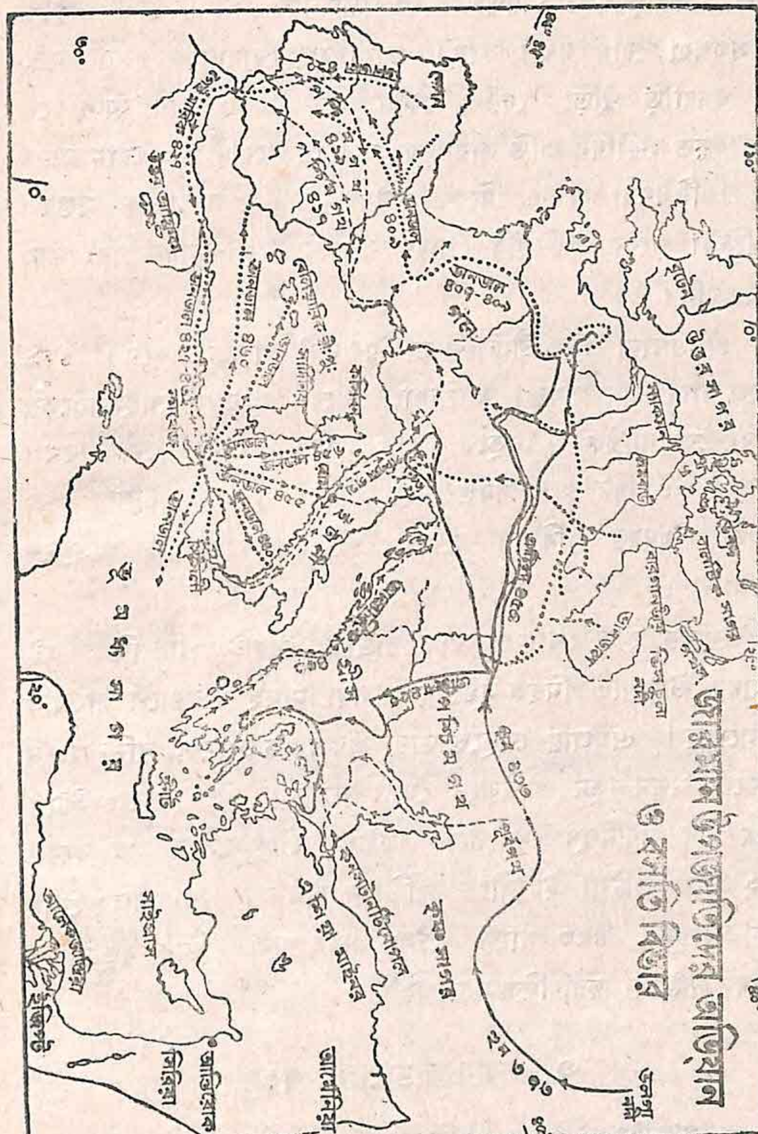
চতুর্থ শতকের শেষ পর্ব থেকে উত্তর ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের বর্বর জাতিরা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ শুরু করেছিল। তারা নানা দলে বিভক্ত ছিল। তাদের আদি বাসস্থানের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

উত্তর ইউরোপ ও উত্তর সাগরের দ্বীপগুলিতে থাকত নর্মম্যান, ডেনস্ ও জুটস্, ভিসচুলা নদীর দুই তীরে থাকত ভানডাল ও বার্গানডীয়রা। ওডার নদীর তীরে থাকত লমবার্ড ও এঙ্গেলরা। কৃষ্ণসাগরের সীমান্তে থাকত অসট্রোগথ (পূর্বগথ) ও ভিসিগথরা (পশ্চিমগথ)।

২. জারমান উপজাতিরা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল কেন?

অনেক কারণেই জারমান উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন হল প্রত্যক্ষ কারণ। তাদের লোক সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল। তাদের চাষবাসের রীতি ছিল একান্তই সেকেলে। জমির উপর খুবই চাপ পড়েছিল। তাই নতুন দেশে তাদের নতুন জমির প্রয়োজন দেখা দিল—পশুচারণের জন্য, আবাদের জন্য। রোম সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য তাদের লুব্ধ করেছিল, রোমের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য তারা আকর্ষণ বোধ করেছিল। রোমের উন্নত সভ্যতার কথাও তারা শুনেছিল। অনেক সময় দেখা গেছে একটা বর্বর জাতির চাপে আর একটি বর্বর জাতি অভিযানে মেতে উঠেছিল। শেষ হুন আক্রমণের চাপে অনেক জারমান উপজাতি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল।

ভিসিগথদের (পশ্চিমগথ) রোম আক্রমণ মধ্যযুগের ইউরোপে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। হুন আক্রমণের চাপে তারা ডানিয়ুব নদীর



তীরে এসে পৌঁছয়। রোম সম্রাট ভ্যালেনের অনুমতিক্রমে তারা রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু সাম্রাজ্যের

রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সম্রাট ভ্যালেন নিহত হন। রোমানরা পরাজিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভিসিগথদের অধিনায়ক আলারিকের ভূমিকা স্মরণীয়। ৪১০ খ্রীস্টাব্দে আলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথরা রোম দখল করে। তারা বহু রোমানকে হত্যা করে, বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কোন চার্চকে কিন্তু তারা ধ্বংস করে নি। ধৃত বন্দীদের প্রতি তারা সদয় ব্যবহার করেছিল। রোম জয়ের পর ভিসিগথরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। আলারিক সম্ভবত আফ্রিকা জয়ের অভিলাষ পোষণ করতেন। কিছুদিন পর তিনি মারা যান।

ভানডালরা ৪০৬ খ্রীস্টাব্দে ডানিয়ুব নদী অতিক্রম করে। ৪২৯ সালে তারা রোম অধিকৃত আফ্রিকাতে প্রবেশ করে। গেইসারিকের (বা জেনসারিক) নেতৃত্বে ৪৫৫ সালে অরক্ষিত রোম দখল করে। ১৪ দিন ধরে সমস্ত শহরে তারা লুটপাট চালায় এবং যাবতীয় ধনরত্ন অধিকার করে। পরে তারা কার্থেজ অভিমুখে রওনা হয়।

হুনদের হাত থেকেও রোম সাম্রাজ্য রেহাই পায় নি। এই যাযাবর উপজাতি নিছক লুণ্ঠনের লালসা নিয়েই ইউরোপে অভিযান চালিয়েছে। এটিলার নেতৃত্বে তারা একতাবদ্ধ হয়েছে, শক্তি অর্জন করেছে, নতুন নতুন অভিযানে মেতে উঠেছে। ৪৫১ সালে ঈটাশ নামে এক রণনিপুণ সেনাপতি এটিলাকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। ৪৫২ সালে এটিলা ইটালীতে অভিযান চালান। পোপ লিও রোম রক্ষা করেন। ৪৫৩ সালে এটিলা মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর হুনদের সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩. রোম সাম্রাজ্যের পতন

জারমান উপজাতিদের বসতি স্থাপন ঃ পঞ্চম শতকে নানা জারমান উপজাতি রোম সাম্রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে এবং নানাস্থানে বসতি গড়েছে। যেমন—উত্তর আফ্রিকায় ভানডালরা, স্পেনে ভিসিগথরা

(পশ্চিমগথ), ব্রিটেনে এঙ্গেলস্ ও জুটরা, গলে ফ্রাঙ্করা এবং ইটালীতে অসট্রোগথরা (পূর্বগথ)।

রোম সাম্রাজ্যের পতন না তুটি রোম সাম্রাজ্যের ঐক্যসাধন: পঞ্চম শতকের শেষে ইটালীর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব রোমানদের হাতে ছিল না। সেখানে বর্বর উপজাতিদের হাতে ছিল রণবাহিনীর দায়িত্ব। এই সময় হেরুলি উপজাতির প্রধান ছিলেন ওডোসার। তিনি ইটালীতে রণবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ইটালীর অর্থাৎ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন তখন নাবালক রমুলাস অগাস্টাস। ওডোসার সম্রাট রমুলাস অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। তখন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন জেনো। ৪৭৬ সালে জেনো ওডোসারকে তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য শাসন করতে বললেন। এইভাবে আলাদা একটি সাম্রাজ্য হিসাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান হল। এই ঘটনাটিই ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের পতনরূপে চিহ্নিত। তবে অনেকে বলেন যে এই ঘটনাটিকে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে। তাঁরা বলেন ৪৭৬ সালে সম্রাট জেনোর অধীনে তুটি রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য গড়ে ওঠে।

৪. জারমান উপজাতিদের জীবনযাত্রার পরিচয়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন: জারমান উপজাতিরা কৃষিকাজে খুব দক্ষ ছিল। রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে তাদের হাতিয়ার ও কলা-কৌশল বেশ উঁচু ধরনের ছিল। যতদিন জমি চাষযোগ্য থাকত, ততদিন সেই জমিতে তারা চাষ করত। জমি অনুর্বর হয়ে গেলে সেই জমি ছেড়ে দিত। তারপর নতুন জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলত। রোম সাম্রাজ্য বিজিত হবার পর তারা রোমানদের চাষের পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতি হল চাষযোগ্য জমিকে তুখণ্ডে ভাগ করা। এক খণ্ড জমিতে যখন চাষের কাজ চলবে, অন্য খণ্ডটি তখন অনাবাদী রাখতে হবে। ফলে উৎপাদন খুব বেড়ে গেল। জারমান উপজাতিরা

শস্যাদি ছাড়াও ফলমূল শাক সব্জী ও আঙুরের চাষ করত। তাছাড়া শিকার করা, মাছ ধরা, মৌমাছির চাষ, পশুপালন প্রভৃতি কাজেও তারা যথেষ্ট নিপুণ ছিল। সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল: (১) সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, (২) স্বাধীন মানুষ (অর্থাৎ যারা ক্রীতদাস নয়), (৩) ক্রীতদাস।

এক একটা জারমান উপজাতি নানা দলীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি দলীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট জমি ছিল। দলীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে সেই জমি চাষ করত। উৎপন্ন ফসলের উপর দলীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সমান মালিকানা ছিল। ইতিমধ্যে চাষের হাতিয়ার ও কলাকৌশলের কিছু উন্নতি হল। তখন থেকে প্রত্যেকটি পরিবার জমি পেল। সেই জমি তারা চাষ করত এবং নিজস্ব প্রয়োজনের ফসল ঘরে তুলত। এইভাবে চাষযোগ্য জমি দলীয় সম্প্রদায়ের হাত থেকে এক একটা পরিবারের হাতে চলে এল।

এক একটি গ্রামে নানা দলীয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব জমিখণ্ড থাকত। এই জমি তারা চাষ করতে পারত, কিন্তু বিক্রি করতে পারত না, বিনিময় করতে পারত না, বা দান করতে পারত না। ফসল ঘরে তোলা হলে, সেই জমি সবাই যৌথ পশুচারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার করত। বন, মাঠ, পতিত জমি আর জল এগুলি ছিল সমাজের যৌথ মালিকানার অধীনে। জারমান সামরিক নেতারা অনেক জমি ভোগ করত। রোম আক্রমণের সময় তারা ধনী রোমানদের অনেক জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এইভাবে তারা প্রচুর জমির মালিক হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা: জারমান উপজাতিদের প্রবল স্বাধীনতা স্পৃহা ছিল। তাই তাদের শাসন কাঠামো গণতান্ত্রিক ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্য থেকে অধিনায়ক বাছাই করা হত। আবার অনেক অধিনায়কের মধ্য থেকে একজন রাজা বেছে নেওয়া হত। এইভাবে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। যারা ক্রীতদাস নয় এমন মানুষ অর্থাৎ সমস্ত স্বাধীন মানুষরা সভাসমিতিতে অংশ নিত। সেখানে সমাজের যাবতীয়

কাজকর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। বিচারের কাজ তারাই করত। শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক আর দলত্যাগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডই ছিল একমাত্র শাস্তি। অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে, এমন কি নরহত্যার ক্ষেত্রেও, অর্থদণ্ডের বিধান ছিল। তখন আইনকানুন ছিল অলিখিত।

ধর্ম বিশ্বাস ঃ জারমান উপজাতিরা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। পূর্বপুরুষদের আরাধনা ও প্রকৃতি পূজা তাদের ধর্মচেতনার মূল কথা ছিল। পুরোহিতদের প্রবল প্রতাপ ছিল। সত্য ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাদের গভীর নিষ্ঠা ছিল। তাদের ধর্মাচরণে নারীরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করত।

জারমান উপজাতিদের উপর খ্রীস্টধর্মের প্রভাব ঃ রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই জারমান উপজাতিরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে গথরাই সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। অনেক খ্রীস্টানকে গথরা বন্দী করেছিল এবং ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। তাদের সংস্পর্শেই নতুন ধর্ম সম্বন্ধে গথদের আগ্রহ জন্মায়। গথদের মধ্যে যারা ধর্মপ্রচার করেন, তাদের মধ্যে উলফিলাসের (খ্রীঃ ৩১১—৮১) নাম বিশেষ পরিচিত। উলফিলাস নিজেও গথ ছিলেন। তিনি পূর্বগথ ডায়ালেক্টে বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। উত্তর ও পশ্চিম জারমানরা অনেক পরে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ ৪১০ আলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথরা রোম দখল করে।
খ্রীঃ ৪৫৫ গেইসারিকের নেতৃত্বে ভানডালরা রোম দখল করে।
খ্রীঃ ৪৫২ এটিলার ইটালী অভিযান।

অনুশীলনী

১। ভানডাল, অসট্রোগথ, ভিসিগথ ও লমবার্ড—এদের আদি বাসস্থান উল্লেখ কর।

২। কি কি কারণে জারমান উপজাতিরা রোম আক্রমণ করেছিল?

৩। নতুন দেশে কেন জারমান উপজাতিদের জমি দখলের প্রয়োজন পড়েছিল?

৪। আলারিক গেইসারিক, এটিলা—এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ভানডাল, ভিসিগথ, এঙ্গেলস, জুটস ও ফ্রাঙ্ক—এই সব জারমান উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্যের কোথায় বসতি বিস্তার করেছিল?

৬। ওডোসার, রমুলাস, অগাস্টাস, জেনো—এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। কিভাবে ৪৭৬ সালে সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল?

৮। জারমান উপজাতিদের চাষের পদ্ধতি কি ধরনের ছিল?

৯। রোমানদের চাষের পদ্ধতি কেমন ছিল?

১০। জারমানরা রোমানদের চাষের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে কি সুফল হয়েছিল?

১১। জারমান উপজাতিদের সমাজ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল?

১২। কিভাবে জারমান উপজাতিদের দলীয় সম্প্রদায়ের জমি পরিবারের অধিকারে চলে আসে?

১৩। জারমান উপজাতিদের মধ্যে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয় কি ভাবে?

১৪। জারমান উপজাতিদের বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল?

১৫। জারমান উপজাতিদের ধর্মচেতনার মূল কথা কি ছিল?

১৬। জারমান উপজাতিরা কি ভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়?

১৭। উলফিলাস কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। রোম সাম্রাজ্যের বিপুল—ও রোমে—জলবায়ুর জন্য তারা আকর্ষণ বোধ করেছিল।

২। তাঁরা বলেন ৪৭৬ সালে সম্রাট জেনোর অধীনে দুটি সাম্রাজ্যের — গড়ে উঠে।

৩। রোম সাম্রাজ্য বিজিত হবার পর তারা রোমানদের—পদ্ধতি গ্রহণ করে।

৪। উৎপন্ন ফসলে দলীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সমান — ছিল।

৫। শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক ও দলত্যাগীদের জন্য — ছিল একমাত্র শাস্তি।

৬। পূর্বপুরুষদের আরাধনা ও প্রকৃতিপূজা তাদের — মূল কথা ছিল।

৭। তাদের ধর্মাচরণে — বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করত।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ

১, মধ্যযুগ কি অন্ধকারময় যুগ ?

মধ্যযুগের মানুষরা কি নিজেদের মধ্যযুগের মানুষ বলে ভাবত ? অবশ্যই না। আধুনিক কালের মানুষরাই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক —এই যুগবিভাগের স্রষ্টা। প্রায় তিনশ বছর আগে জারমান পণ্ডিত কেলার বা সেলারিয়াস (Kelar or Cellarius) মধ্যযুগ কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন। রোমের সভ্যতা ও নবজাগরণ এই দুই যুগের মধ্যবর্তী পর্বকে তিনি "মধ্যযুগ" বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই চিন্তা পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকদের অনেকেই মেনে নিয়েছেন।

শুধু মধ্যবর্তী পর্ব বোঝাতেই নয়, তাঁদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগের আর একটি অর্থ হল অন্ধকারময় যুগ। এই যুগে সভ্যতার অগ্রগতি বন্ধ। মানুষের জীবন তখন জ্ঞান চর্চায় আলোকিত নয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে মানুষের মন আচ্ছন্ন। এই কারণেই এই যুগ অন্ধকারময় যুগ নামে পরিচিত।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই মধ্যযুগকে অন্ধকারময় যুগ রূপে অভিহিত করতে চান না। নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ হল মানুষ সম্পর্কে মমতা, প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ, জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল। মানুষ, প্রকৃতি ও জগৎকে জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মধ্যযুগের মানুষের মনেও জাগ্রত ছিল। যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে, বিচার করে সব কিছু বোঝার চেষ্টা সে যুগে দেখা গেছে। আধুনিক যুগের মানুষ কৃত্রিম, আড়ষ্ট ও ক্লান্ত। তুলনায় মধ্যযুগের মানুষ সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত।

২. খ্রীস্টান ধর্মমঠে জ্ঞানচর্চা

রোম সাম্রাজ্যে বর্বর জারমান উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটলে খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। ধর্মযাজকদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজকর্মচারীদের খুব একটা খ্যাতি বা প্রতিপত্তি ছিল না। এই কারণে চার্চের কাজে অনেক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষরা এসে যোগ দিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে গল অঞ্চলের বিশপরা এসেছিলেন ধনী শিক্ষিত প্রভাবশালী বংশ থেকে। তাঁদের উৎসাহে চার্চের হাতে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব এসে গেল।

সে যুগে ক্যাসিওডোরাস (খ্রীঃ ৪৯০-৫৮৫) নামে একজন বিখ্যাত ধর্মযাজক ছিলেন। দক্ষিণ ইটালীতে তিনি দুটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন।



মঠের সন্ন্যাসী পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরী করছেন

এই মঠ ছিল ধর্মচর্চার পীঠস্থান। তাঁর মঠে অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরী করতেন। অনেক গ্রীক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের তিনি আয়োজন করেছিলেন। তিনি একটি বিশ্বকোষও প্রণয়ন করেন। বিশ্বকোষে ব্যাকরণ, অঙ্ক, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি,

অলঙ্কার শাস্ত্র, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা—এসব বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ফ্রাঙ্কদের ঐতিহাসিক গ্রেগরী (খ্রীঃ ৫৩৮-৫৯৪) এই যুগের আর একটি স্মরণীয় নাম। সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আজগুবি গল্প শোনান নি। নিজের চোখে যা দেখেছেন তাই তিনি লিখেছেন। এইভাবে জ্ঞানচর্চার কাজে চার্চের ধর্মযাজকরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

৩. ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ, সমাজ ও সভ্যতায় তার প্রভাব

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মানুষ বর্তমান জীবনকেই বড় বলে মানত। এই জীবনে ধনসম্পদ ভোগ করা, আনন্দ করা, বিলাসিতা ও আড়ম্বরে গা ভাসিয়ে দেওয়াকেই তারা বাঁচার মত বাঁচা বলে মনে করত। পরবর্তী কালে খ্রীস্টান ধর্ম শেখাল এ জীবন ক্ষণিক, মৃত্যুর পরপারের জীবনটা অনন্ত। এ জীবনে আমাদের পরপারের জীবনের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। নিজেকে প্রস্তুত করা মানে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ না করা। এইভাবে মানুষের চিন্তায় ভাল-মন্দ ধারণা গড়ে উঠল।

জারমান উপজাতিরাও খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শে এসে ভালমন্দ ধারণা শিখে নিল। তারা শিখল যে তাদের মৃত্যুর পরপারের জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করছে চার্চের উপর। একমাত্র চার্চই তাদের স্বর্গ-সুখের সন্ধান দিতে পারে। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে অতীত পাপ মুছে যাবে। কিন্তু নতুন করে যাতে পাপের দিকে মন না যায়, তার জন্য অহরহ চার্চের সংস্পর্শে থাকা দরকার। চার্চের বিশপদের সম্মান করা দরকার। চার্চকে ধনসম্পত্তি দান করা দরকার। এ সব মেনে চলা হতে লাগল বলে চার্চের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল। সমাজের দুঃখী মানুষ, আত্মরক্ষার জন্য, রাজার উপর নয়, চার্চের উপর বেশি নির্ভর করেছিল। চার্চ সমাজের ভালমন্দের দিকেও নজর দিয়েছিল। কারও সঙ্গে কোন চুক্তি হলে মেনে চলা ভাল, চুক্তি ভঙ্গ করা অন্যায়।

মৃত লোকের উইল মত কাজ করা ভাল, উইল না মানা অন্যায়। চার্চের কাছ থেকে জারমান উপজাতিরা এসব ন্যায় অন্যায় বোধ শিখেছিল। বিধবা আর পিতামাতাহীন শিশুরা আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তা পেল। ভাল কাজে ধনসম্পত্তি দানের প্রবণতা দেখা দিল। সুশিক্ষার জন্য আগ্রহও বাড়ল। ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ এই ভাবে মধ্যযুগীয় সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগ কথাটি প্রথম কে প্রয়োগ করেন ?

২। মধ্যযুগকে অন্ধকারময় যুগ বলা হয় কেন ?

৩। কি কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে মধ্যযুগকে অন্ধকারময় যুগরূপে অভিহিত করতে চান না ?

৪। চার্চের হাতে কিভাবে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব এসেছিল ?

৫। ক্যাসিওডোরাস কে ছিলেন ? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন ?

৬। ফ্রাঙ্কদের ঐতিহাসিক গ্রেগরী ইতিহাসের ঘটনা কিভাবে বর্ণনা করেছেন ?

৭। খ্রীস্টানদের ধর্মীয় চিন্তায় কিভাবে ভালমন্দ ধারণা গড়ে উঠেছিল ?

৮। সমাজের দুঃখী মানুষ চার্চের উপর বেশি নির্ভর করেছিল কেন ?

৯। চার্চের কাছ থেকে জারমান উপজাতিরা কি ভাবে ন্যায় অন্যায় বোধ শিখেছিল ?

১০। কিভাবে ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ মধ্যযুগীয় সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও — অন্ধকারে মানুষের মন আচ্ছন্ন।

২। নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ হল মানুষ সম্পর্কে — প্রকৃতি সম্পর্কে — জগৎ সম্পর্কে —।

৩। আধুনিক যুগের মানুষ — আড়ষ্ট ও ক্লান্ত।

৪। পরবর্তী কালে খ্রীস্টান ধর্ম শেখাল, এ জীবন — মৃত্যুর পরপারের জীবন —।

৫। চার্চ তখন সমাজের — দিকেও নজর দিয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজানটাইন সভ্যতা

১. কনস্টানটিনোপলের প্রতিষ্ঠা

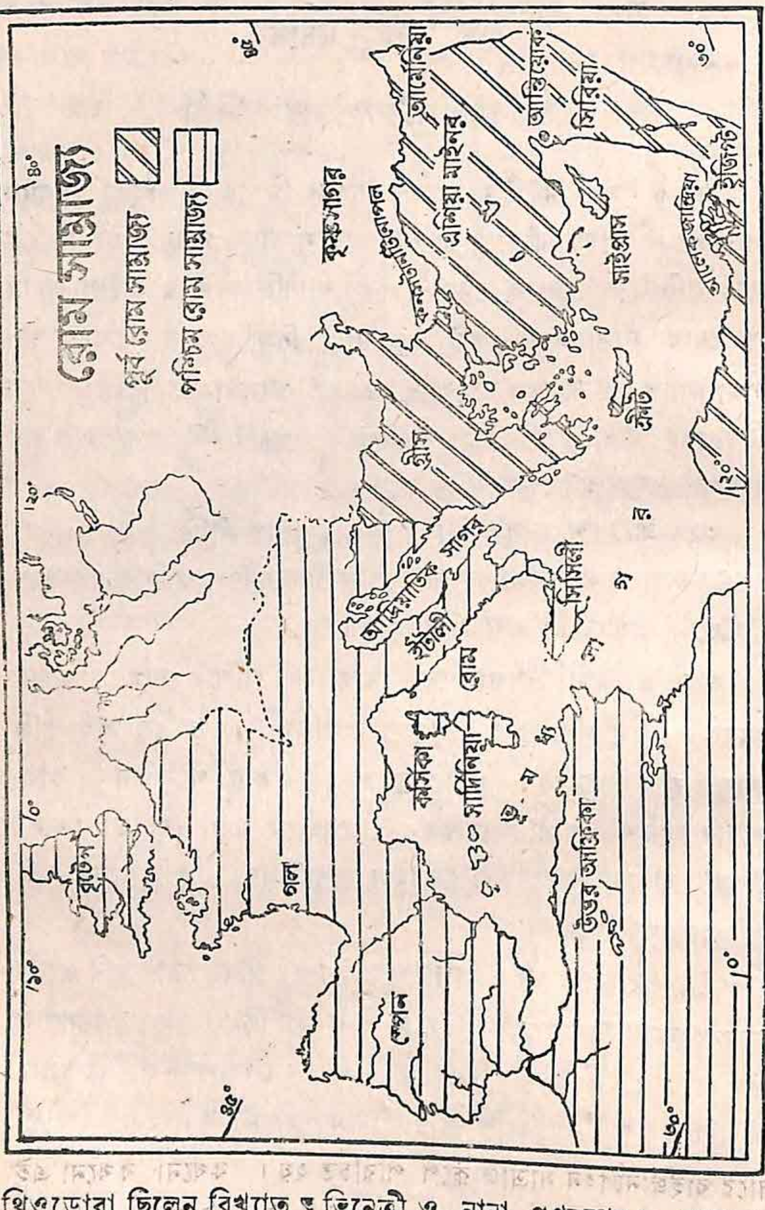
সম্রাট কনস্টানটাইন রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত। বাইজানটিয়ামে যে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে তিনিই তার প্রতিষ্ঠাতা। তার চেষ্টায় পুরাতন বাণিজ্যিক শহর বাইজানটিয়ান পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের একটি বড় নগর হিসাবে গড়ে ওঠে। তাঁর নামানুসারে এই নগরের নামকরণ করা হয় কনস্টানটিনোপল। মাত্র ৬ বছরের মধ্যে তিনি এই নগরটিকে বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান রাজধানী নগর হিসাবে গড়ে তোলেন।

৩২৪ খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটাইন ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসাবে তিনি খ্রীস্ট ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেন। খ্রীস্টধর্মের প্রসারে তিনি উৎসাহ যোগালেন।

বর্বর জারমান উপজাতিদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে অনেকদিন ধরে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলেছিল। বড় বড় শহরগুলি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। ধনী মানুষরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। চাষ-আবাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পথেঘাটে দস্যু এবং ডাকাতদের উপদ্রবে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল অশান্তিময়। লেখাপড়ার চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই দুঃসময়ে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার ছবি একেবারে অন্যরকমের। সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ছিল। লেখাপড়া ও শিল্পকলার চর্চা ছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য প্রাচীন বাইজানটিয়াম নগরের নামানুসারে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যরূপে পরিচিত হয়। কখনো কখনো এই সাম্রাজ্যকে বাইজানটিয়াম বলা হয়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সভ্যতা বাইজানটাইন সভ্যতা নামে পরিচিত। সম্রাট জাসটিনিয়ান

(খ্রীঃ ৫২৭-৬৫) ছিলেন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রতিভার অধিকারী। তাঁর স্ত্রী



থিওডোরা ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী ও নানা গুণসম্পন্ন। সাম্রাজ্য শাসনের কাজে থিওডোরা ছিলেন যোগ্য সহধর্মিণী।

২। জাসটিনিয়ানের লক্ষ্য—ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

জারমান বর্বর-উপজাতিদের অভিযান হঠাৎ শুরু হয় নি, আবার হঠাৎ থেমেও যায় নি। দীর্ঘকাল ধরে এই অভিযান চলেছে। সমস্যা হল এই সংকটের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ সম্ভব। পরিত্রাণের পথ হিসাবে জাসটিনিয়ানের মূল লক্ষ্যই ছিল ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি পারস্য ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আফ্রিকাতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। আন্তিয়োক উদ্ধার করেছিলেন। আফ্রিকা, ডালমাশিয়া, ইটালী, কর্সিকা, সার্দিনিয়া, সিসিলী এবং স্পেনের কিছু অংশ তিনি উদ্ধার করেছিলেন। সিরিয়া থেকে পারসিকদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁর আমলে রোম সাম্রাজ্য দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছিল।



জাসটিনিয়ান

৩। জাস্টিনিয়ানের সংকলন, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় উৎসাহ দান

আইনপ্রণেতা হিসাবে জাসটিনিয়ানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তিনি ছিলেন প্রচলিত আইনের সংকলক। তাঁর আইনের সংকলন 'দ্য কোডেক্স', 'দ্য ডাইজেস্ট', 'দ্য ইনস্টিটিউট' ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। এইসব সংকলনের মধ্য দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে রোমান আইনের সারকথা পৌঁছে দিয়েছেন। এ সব সংকলন না থাকলে রোমান আইনগুলি একেবারে হারিয়ে যেত। সভ্য

সমাজের নিয়মকানুনগুলিই রোমান আইনের সারবস্তু। ব্যাক্তিগত সম্পত্তির ভোগদখল, পরিবারে কার কি অধিকার ও কর্তব্য, চুক্তির শর্ত মেনে চলা, বাণিজ্যিক লেনদেন এসব বিষয়ে নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত আছে রোমান আইনে। রোমান আইন গড়ে উঠেছিল প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিকে ভিত্তি করে। হানাহানি ও যুদ্ধের আতঙ্ক যখন ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে, রোমান আইনকে আশ্রয় করে সেই দেশগুলি শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে পেয়েছে। পরবর্তী যুগে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আইনে জাস্টিনিয়ানের সংকলনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সৌধনির্মাতা হিসাবেও জাস্টিনিয়ান অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন। সমসাময়িক লেখক প্রোকোপিয়াস জাস্টিনিয়ানের স্তুতি করে একটি



সান্তা সোফিয়ার চার্চ

বই লিখেছেন। তিনি জাস্টিনিয়ানের নির্মাণ কার্যের তালিকায় উল্লেখ করেছেন কনস্টানটিনোপলের চার্চ ও প্রাসাদ, পারস্য সীমান্ত, আর্মেনিয়া ও ককেশাস অঞ্চল, বল্কান অঞ্চল, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় নির্মিত নগরগুলি। উত্তর আফ্রিকার সীমান্তে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ডানিয়ুবের তীরে তৈরী করিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা প্রাচীর। শিল্পভাস্কর্যের দিক দিয়ে তিনি

বাইজানটানই সভ্যতার স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠাতা। সুদৃশ্য সৌধের মধ্যে কনস্টানটিনোপলের 'ক্যাথিড্রাল অব দি হোলি উইসডম্', ইটালীর 'ব্যাসিলিকা অল সেণ্ট পোলেনেয়ার' আর র‍্যাভেনার 'চার্চ অব সেণ্ট ভিটেল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সান্তা সোফিয়ার চিত্রশিল্পে গ্রীসের শিল্পরীতির সঙ্গে প্রাচ্যের শিল্পরীতি মিশে এক নতুন শিল্প-কলার জন্ম দিয়েছে। মাউণ্ট অ্যাথোস মঠের দেওয়ালের ফ্রেসকো চিত্রগুলি নয়নভোলানো। এই চিত্রকলা পরবর্তীকালে অর্থাৎ নব-জাগরণের সময় ইটালীর চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছে। পাণ্ডুলিপির অলঙ্করণে বাইজানটাইন শিল্পীদের মৌলিকতা স্পষ্ট।

৪. বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বাইজানটাইনের গুরুত্ব

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। যেমন ইজিপ্ট, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং গ্রীস। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় এইসব অঞ্চলে স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা ছিল খুব বেশি, ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই কারণে চাষবাস খুব ভাল হত। গ্রামের লোকেরা শহরে অনেক পরিমাণে শস্য, মাখন, মাংস ও অন্যান্য উৎপন্ন জিনিস বিক্রি করত।

পশ্চিম ইউরোপে নগরগুলি দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে নগরগুলি ধনে সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। কনস্টানটিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্তিয়োক নগরে হাজার হাজার লোক বাস করত। এইসব শহরের পথে ঘাটে হাটে বাজারে অসংখ্য দোকান ও কারখানা ছিল। কারিগররা দামী অস্ত্রশস্ত্র, মসৃণ রেশম, গয়না ও কাঁচের বাসন-পত্র তৈরি করত।

দুটি বিখ্যাত বাণিজ্যপথের সন্নিকটে কনস্টানটিনোপল অবস্থিত। একটি হল ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত স্থলপথ এবং অপরটি হল ভূমধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথ। অগণিত বাণিজ্যপোত কনস্টানটিনোপলের বন্দরে ভীড় করে থাকত। বসফোরাস প্রণালী হয়ে কৃষ্ণসাগরে এবং দার্দানেলিস প্রণালী হয়ে

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 29. 6. 89
S.C.E.R.T., West Bengal Library

ঈজিয়ান সাগরে এইসব বাণিজ্যতরী চলাফেরা করত। পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গেও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

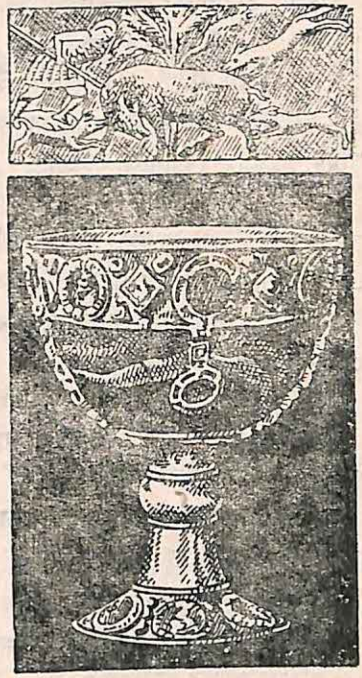
বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে অটুট ছিল, কারণ তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ খুব শক্ত ছিল। সম্রাটের আয় ছিল প্রচুর। উৎপন্ন জিনিস ও ব্যবসা থেকেই তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। চাষীদের উপর গুরু করভার ছিল। বণিকদের উপর গুরু শুল্ক চাপান ছিল। রাজকোষে অপরিমেয় সোনারূপা মজুত ছিল। তা দিয়ে তিনি বিরাট সেনাবাহিনী আর শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

৫. সভ্যতার ক্ষেত্রে বাইজানটিয়ামের অবদান

দূরদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে, সেই দেশের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার কথা জানা প্রয়োজন। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বণিকরা এ সত্য ভালভাবেই জানত। দেশদেশান্তর থেকে তারা যেসব খবরাখবর এনে দিত, পণ্ডিতরা সেসব শুনে বড় বড় বই লিখতেন। বাইজানটিয়ামের ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশগুলির ইতিহাস ও ভূগোল অনেক লেখা হয়েছিল। শিল্পকলা, স্থপতিবিদ্যা ও যুদ্ধশাস্ত্রের জন্য অনেক দক্ষ লোক দরকার। শাসনকাজ চালানোর জন্য ও কর আদায়ের জন্যও প্রচুর শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। তাই অনেক বিদ্যালয় গড়ে উঠল। সেখানে লেখাপড়া ও হিসেব রাখার বিদ্যা শেখান হত। গ্রীক লেখক ও বিজ্ঞানীদের বই পড়ান হত। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় নিপুণ পণ্ডিতদের দিয়ে কনস্টানটিনোপলে একটি সমিতি গড়া হয়েছিল। তাঁরা দুষ্প্রাপ্য বই খুঁজে বের করতেন, সেগুলির প্রতিলিপি তৈরি করতেন এবং রাজকীয় পাঠাগারে সেগুলি সুরক্ষণের আয়োজন করতেন। গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীর চর্চা ছিল। অসংখ্য পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলি সুরক্ষণেরও আয়োজন করা হয়েছিল। জ্ঞানকোষ ও অভিধান সংগ্রহের কাজেও তারা মনোনিবেশ করেছিল। ইতিহাস

রচনা, সাধুসন্তদের জীবনী প্রণয়ন, চিকিৎসা বিদ্যা, আইনশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ লেখা সবদিকেই তখনকার পণ্ডিতরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাইজানটাইন শিল্পী কারিগরদের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের রাজা, সামন্ত ও বিশপরা তাদেরকে নিজের নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত।

রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশ থেকে রাজদূত, বণিক ও ধর্মযাজক প্রায়ই বাইজানটিয়ামে বেড়াতে আসত। পশ্চিম ও দক্ষিণের শ্লাভরা বাইজানটাইন সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হল। অনেক তরুণ সেখানে গিয়েছিল চিকিৎসাশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ও রোমান আইন অধ্যয়ন করতে। ঐ সব দেশের ভাস্কর শিল্পীরা বাইজানটাইন আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিল। অনেক গ্রীক ভাষার গ্রন্থ শ্লাভ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।



বাইজানটাইন শিল্প ঃ
উপরে ঃ হাতির দাঁতের বাক্সে বন্য শূকর শিকারের দৃশ্য। বাইজানটাইন রাজসভায় বন্য শূকর শিকার একটি জনপ্রিয় আমোদ ছিল। নিচে ঃ সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত পানপাত্র

গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগৎবাসী পেয়েছে বাইজানটিয়ামের কাছ থেকে। বাইজানটাইন সভ্যতা এসবকে সংরক্ষণ না করলে এগুলি নিঃশেষে হারিয়ে যেত।

অনুশীলনী

১। রোমের কোন সম্রাটকে রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?
২। কনস্টানটিনোপল কার নামানুসারে সৃষ্টি হয়েছিল?
৩। সম্রাট জাসটিনিয়ানের মূল লক্ষ্য কি ছিল?

৪। কোন কোন দেশ সম্রাট জাসটিনিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন ?

৫। জাসটিনিয়ানের আইন সংকলন কি নামে পরিচিত ?

৬। জাসটিনিয়ানের আইন সংকলনের গুরুত্ব বিচার কর।

৭। ইউরোপের দেশগুলিতে রোমান আইনের কি অবদান ছিল ?

৮। জাস্‌টিনিয়ানের কোন কোন নির্মাণকার্য প্রোকোপিয়াস উল্লেখ করেছেন।

৯। জাসটিনিয়ানের আমলে নির্মিত তিনটি সুদৃশ্য সৌধের নাম কর।

১০। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে খুব ভাল চাষবাস হত কেন ? সেখানে গ্রামের মানুষ শহরে কি কি বিক্রি করত ?

১১। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে নগরগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছিল কেন ?

১২। "দুটি বিখ্যাত বাণিজ্যপথের সন্নিকটে কনসটানটিনোপল অবস্থিত।" এই দুটি বাণিজ্যপথ উল্লেখ কর।

১৩। কোন কোন দেশের সঙ্গে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল ?

১৪। কি কি কারণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে অটুট ছিল ?

১৫। বাইজানটিয়াম ও তার আশেপাশের দেশগুলির অনেক ইতিহাস ও ভূগোল লেখা হয়েছিল কেন ?

১৬। বাইজানটিয়াম অঞ্চলে অনেক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল কেন ? বিদ্যালয়ে কি কি শেখান বা পড়ান হত ?

১৭। তখনকার পণ্ডিতেরা কি কি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ?

১৮। বাইজানটাইন সভ্যতা কিভাবে রাশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। — খ্রীস্টাব্দে কনস্‌টানটাইন — নীতিকে গ্রহণ করেন।

২। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসাবে তিনি — স্বীকৃতি দিলেন।

৩। পরবর্তীযুগে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের — জাসটিনিয়ানের সংকলনের — সুস্পষ্ট।

৪। শিল্প ভাস্কর্যের দিক দিয়ে তিনি বাইজানটাইন সভ্যতার — প্রতিষ্ঠাতা।

৫। পাণ্ডুলিপির — বাইজানটাইন শিল্পীদের — স্পষ্ট।

৬। তাঁরা — বই খুঁজে বের করতেন, সেগুলির — তৈরী করতেন, এবং রাজকীয় পাঠাগারে সেগুলির — আয়োজন করতেন।

৭। অনেক গ্রীক ভাষার গ্রন্থ — ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

৮। গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগৎবাসী পেয়েছে — কাছ থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব

১. আরব—দেশ ও মানুষের পরিচয়

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব উপদ্বীপ। এখানে জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ। বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। এখানে কোথাও আছে শুকনো স্তেপভূমি কোথাও সূর্যদগ্ধ মরুভূমি।

বেদুইনদের জীবনযাত্রা ঃ আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের মানুষ স্তেপভূমিতে বাস করত। পশুপালন তাদের একমাত্র পেশা। আরবের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর। তারা বেদুইন নামে পরিচিত। তারা উট, ছাগল আর ঘোড়া পালন করত। পশুদের দলবল নিয়ে তারা স্তেপভূমিতে ঘুরে বেড়াত। তাদের কঠোর জীবনে উটই ছিল চিরসঙ্গী। তারা উটের মাংস খেত, উটের দুধ পান করত এবং উটের লোম দিয়ে তৈরি পোশাক পরত। বেদুইনরা যখন স্থানান্তরে যেত, উট তখন পিঠের উপর তাঁবু ও অন্যান্য জিনিস বহন করে নিয়ে যেত।

অ-যাযাবর আরবদের জীবনযাত্রা ঃ আরবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ওয়েসিসে বাস করত অ-যাযাবর আরবরা। কৃষি, কারিগরি এবং বাণিজ্য ছিল তাদের মূল পেশা। বাইজানটিয়াম থেকে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের দিকে একটি বাণিজ্য সড়ক ছিল। এই সড়ক লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে গিয়েছিল। আরবদের বাণিজ্যগঞ্জ এই পথের ধারে গড়ে উঠেছিল। এইসব বাণিজ্যগঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মক্কা নগর।

আরবদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ যাযাবর আরবরা অ-যাযাবর আরবদের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। তারা তাদের পশুদল নিয়ে মক্কা যেত। সেখানে পশুর সঙ্গে শস্য, জামা কাপড় আর অস্ত্রশস্ত্র বিনিময় করত। বছরে কয়েকবার মক্কার বণিকরা বড় দলবল নিয়ে আশেপাশের

দেশগুলিতে বাণিজ্য করতে যেত। আরবের উত্তরে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। আরবের পূর্বে ইরান। আরবরা ব্যবসা বাণিজ্য চালাত এই সব দেশের সঙ্গে।

আরবদের ট্রাইবাল সমাজ ব্যবস্থা ঃ সপ্তম শতকে আরবদের সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একে বলা হয় ট্রাইবাল সমাজ ব্যবস্থা বা দলগত সম্প্রদায়কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা। পশু চারণভূমি ছিল সম্প্রদায় বা দলের দখলে। পশুদল ছিল পরিবারের সম্পত্তি। ভাল চারণভূমির দখল নিয়ে দলে দলে বিবাদ হত। প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব আরাধ্য দেবতা ছিল। প্রত্যেকটি দলকে চালাত একজন করে প্রধান নেতা। লুণ্ঠন ও যুদ্ধের সময় সে সেনাবাহিনী পরিচালনা করত।

২. হজরত মহম্মদের জীবন ও বাণী

হজরত মহম্মদের পরিচয় ঃ ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কাতে সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম হয় খুব দরিদ্র সংসারে। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের ৬ বৎসর পরে তাঁর মা মারা যান। তাঁর জন্মের আগেই পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁর ঠাকুরদাদা এবং কাকা তাঁকে লালন পালন করেন। তাঁর কাকা ছিলেন ব্যবসাদার। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা নামে একজন ধনী মহিলার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন। পরে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। খাদিজার ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনি প্রায়ই সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে যেতেন। সেখানে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের একেশ্বরবাদী ধর্মমতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। আরবদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তখন থেকেই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নতুন ধর্মমতের সন্ধান পেলেন। মরুপ্রান্তরে দেবদূত গাব্রিয়েল মাঝে মাঝেই তাঁকে দর্শন দিতেন। দেবদূত গাব্রিয়েলের কাছ

থেকে তিনি একেশ্বরের মহিমা প্রচারের প্রেরণা পেয়েছিলেন। সবাই মহম্মদের এ সব কথা শুনে তাঁকে পাগল ভাবত। কিন্তু খাদিজা ভক্তিভরে তাঁকে উৎসাহ দিতেন।

হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মের নাম **ইসলাম ধর্ম**। প্রথমে পরিবারের লোকজন ও সহচরদের তিনি দীক্ষিত করেন। পরে কয়েক জন ক্রীতদাসকে। ১০ বছর ধরে তিনি মক্কায় ধর্মপ্রচার করেছেন। মক্কাবাসীদের মূর্তি পূজা, জুয়া খেলা, মদ্যপানের অভ্যাস ও নারী হত্যার নিন্দা করেছেন।

মহম্মদের মদিনা যাত্রা ঃ হজরত মহম্মদের ধর্মপ্রচারে মক্কার লোকজন খুব রেগে গেল। অনেকে নানাভাবে তাঁকে নাজেহাল ও অপমান করতে লাগল। তাঁকে একেবারে মেরে ফেলার কথাও অনেকে ভাবতে লাগল। তখন বন্ধু ও শিষ্য আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ একদিন মদিনায় এসে পৌঁছলেন। মদিনার মানুষ তাঁকে খুব সমাদর করে আশ্রয় দিল। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মদিনা যাত্রা করেছিলেন। মুসলমানদের কাছে এই বছরটি তাই খুব পবিত্র। এই বছর থেকেই মুসলমানদের নতুন বছর অর্থাৎ হিজরী সন গণনা করা হয়।

মহম্মদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন ঃ মহম্মদ মদিনায় চলে আসার পর মক্কার সঙ্গে মদিনার প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মক্কা হেরে গেল। সাত বছর পর মহম্মদ মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কাবাসী তখন মহম্মদের বাণী বুঝতে শিখেছে। তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এর পর থেকেই ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদের দেহাবসান ঘটে।

ইসলামের প্রধান বাণী ঃ ইসলামের কয়েকটি মূল বাণী ও নীতি হল ঃ

(১) আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর। আল্লা এক ও অদ্বিতীয়।

(২) হজরত মহম্মদ স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেরিত দূত।

ঈশ্বরের বাণী তিনি নিজে কিছুই লিখে রাখেন নি। তাঁর সঙ্গে

লিপিকার থাকত। যখন তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেতেন ও মুখে মুখে বলতেন লিপিকাররা সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে রাখত। ঈশ্বরের এই বাণীগুলির সংকলন হল কোরান। হিন্দুদের যেমন বেদ, খ্রীস্টানদের বাইবেল, জরথুশ্‌ত্রীয়দের আবেস্ত, ঠিক তেমনি মুসলমানদের কোরাণ অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

(৩) প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ অবশ্য কর্তব্য।

(৪ বছরে একবার রমজানের উপবাস অবশ্য পালনীয়।

(৫) প্রতিটি মুসলমানের জাকাৎ বা ভিক্ষাদান করা উচিত।

(৬) জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া উচিত।

ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ নেই। ছোট বড়র তফাৎ নেই। সকলেই আল্লার সন্তান। সুতরাং আল্লার চোখে সব মুসলমান সমান, সব মুসলমানই ভাই ভাই। নমাজে রাজা ফকির সবাই একই সঙ্গে সমবেত হয়।

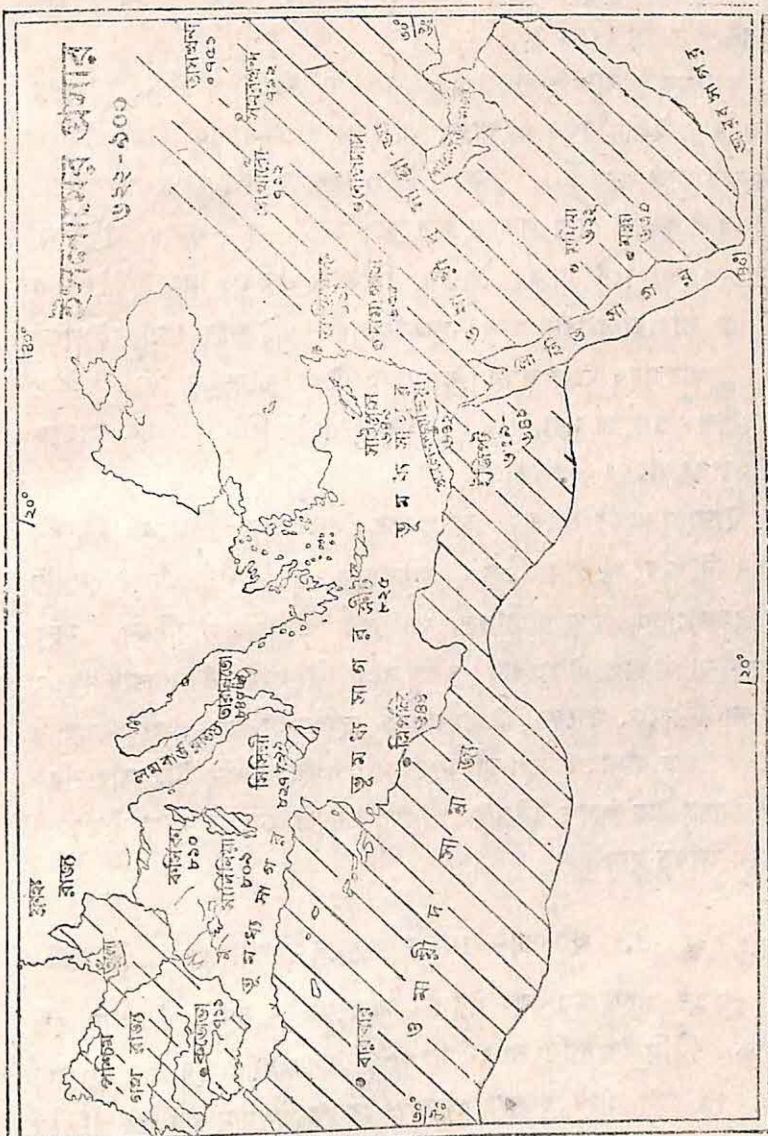
৩. ইসলামের সাফল্যের কারণ

ইসলামের বিস্তার ঃ হজরত মহম্মদের দেহাবসানের একশ বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। পারস্য, সিরিয়া, ইজিপ্ট, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ভারতে সিন্ধু রাজ্যেও তাদের একটি বাহিনী প্রবেশ করে। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের হাত থেকে তারা আফ্রিকা ছিনিয়ে নেয় এবং ভিসিগথদের হাত থেকে স্পেন। পশ্চিমে ফ্রান্স ও পূর্বে কনস্টানটিনোপল তাদের অভিযানে ভীত বোধ করেছিল। প্রশ্ন জাগে, আরব সাম্রাজ্যের এই বিস্ময়কর বিস্তৃতির মূল কারণ কি?

ধর্ম সহিষ্ণুতা ঃ হজরত মহম্মদের সময় আরবের মুসলমানরা ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি মেনে চলেছিল। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সম্পর্কে সহিষ্ণু ছিল বলেই সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে তারা সফলতা লাভ করেছিল।

অভিযানের স্পৃহা ঃ আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বেদুইনরা যখন বাইরে বেরিয়ে পড়ত, তখন তাদের না ছিল নতুন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা,

না ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচারের স্বপ্ন। মহম্মদের জন্মের অনেক আগে থেকেই তারা উপদ্বীপের বাইরে অভিযান চালাত এবং প্রায়ই আশে-পাশের অঞ্চলে লুঠতরাজ করত। কঠোর জলবায়ু ও দুঃসহ দারিদ্রের



হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্তই তাদের অভিযান স্পৃহা জেগে উঠত। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য বিস্তারে অভিযান স্পৃহা শক্তি জুগিয়েছে।

শক্তিশালী প্রতিরোধের অভাব : আরব সাম্রাজ্যের রাজ্য বিস্তারের সময় বাইজানটিয়াম বিধ্বস্ত এবং পারস্য পরাজিত। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ইজিপ্টের মানুষ তখন নানা করের গুরুভারে পীড়িত। আরবদের রাজ্য বিস্তারে তাই কোন দেশ বাধা দিতে পারে নি। বিজিত দেশের মানুষ খুব সহজেই মেনে নিয়েছে আরবদের শাসন ও আধিপত্য।

আর্থিক সুযোগের প্রত্যাশা : বহুদিন আগে থেকেই আরবের মানুষরা বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করেছে। ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে আশেপাশের অঞ্চলে লুঠতরাজ করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বাইজানটিয়ামের ভাড়াটে আরব সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহী সৈন্যরা মদিনার সাহায্য প্রার্থনা করে। রাজ্যবিস্তারের এই সুযোগ মদিনা ছাড়ল না। আরবদের মধ্যে তখন নিঃসন্দেহে ঐক্য গড়ে উঠেছে। ঐক্য এসেছিল যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে। রাজ্যবিস্তারের পিছনে কাজ করেছে আর্থিক সুযোগের প্রত্যাশা।

ইসলাম ধর্মের বন্ধন : আরবদের সফলতার পিছনে ইসলাম ধর্মের নিশ্চিত অবদান ছিল। লুঠতরাজ ও রাজ্যবিস্তারের নেশায় যে একতাবোধ গড়ে উঠেছিল, তা ছিল একান্তই সাময়িক। মহৎ চেতনা না থাকলে ঐক্যবোধ দৃঢ় হয় না। ইসলাম ধর্ম আরবদের মহৎ চেতনা দিয়েছে, তাদের ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করেছে। শুধু তরবারি দিয়ে বিজিত রাজাকে বশে রাখা যায় না। প্রয়োজন হয় উচ্চ আদর্শের। ইসলামের উচ্চ আদর্শ দিয়েই আরব অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

৪. খলিফা—ধর্ম ও রাষ্ট্রের একীকরণ

হজরত মহম্মদের পর ইসলাম জগতের শাসন কর্তার নাম হল খলিফা। তিনি ঈশ্বর নিযুক্ত ধর্মগুরু—একাধারে ধর্মপ্রধান ও রাষ্ট্রপাল। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান পর পর খলিফা

হন। তারা খুব সাদাসিধা ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। হজরত আবু বকর যখন খলিফা, তখন হজরত মহম্মদের জামাই হজরত আলিকে খলিফা করার জন্য একটি দল তৈরী হয়। তখন থেকে তাঁদের মধ্যে দলাদলি শুরু হল। দলাদলিতে আলি নিহত হলেন। ৬৬১ সালে সেই দল আলির পুত্র হাসানকে খলিফা নির্বাচিত করে। কিন্তু তৃতীয় খলিফা ওসমান বংশীয় মোয়াবিয়ার দলের খুব দাপট। ফলে তাঁকেও খলিফা নির্বাচিত করা হল। হাসান খলিফা পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কেউ বলেন প্রথম চারজন প্রকৃত খলিফা। কেউ বলেন হাসান সহ পাঁচজন প্রকৃত খলিফা। তখন খলিফা পদটি নির্বাচনমূলক ছিল। তৃতীয় খলিফা ওসমানের বংশধর মোয়াবিয়ার সময় থেকে খলিফা পদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। মোয়াবিয়ার বংশধররা ইতিহাসে ওমায়ীদ খলিফা নামে পরিচিত। তাদের আমলে দামাস্কাস ছিল ইসলাম জগতের রাজধানী। আরবদের মধ্যে হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের একটি দল ছিল। ইসলামের প্রচারের অনেক আগে থেকেই আব্বাসীয়দের সঙ্গে ওমায়ীদদের বিরোধ ছিল। বিরোধের ফলে ওমায়ীদদের পরাজয় ঘটে। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে খলিফাপদ আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়। ৭৫০ থেকে ১২৫৮ পর্যন্ত পাঁচশত বৎসর আব্বাসীয় খলিফারা রাজত্ব করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল ইরাকের বাগদাদে। এক খলিফার শাসনের বিরুদ্ধে নানা বিদ্রোহ দেখা দিল। মধ্য এশিয়ার খোরাসানে এক নতুন খলিফা নির্বাচিত করা হল। স্পেনের কর্ডোভাতেও নতুন খলিফা নির্বাচিত হল। মিশরে মহম্মদের কন্যা ফতিমার এক বংশধরকে খলিফা করা হল। সেখানে ফতেমীয় খলিফা বংশ প্রতিষ্ঠিত হল।

৫. সভ্যতার ভাণ্ডারে আরবদের অবদান

আরব সাম্রাজ্যের দেশগুলিতে কৃষি বিস্তার ঘটেছিল। বিপুল পরিশ্রম করে আরবের কৃষকরা শুষ্ক স্তেপভূমি চাষযোগ্য করেছে।

সেচসিক্ত এলাকায় যব, গম, খেজুর ও আখের চাষ তারা প্রবর্তন করেছিল। আরবের মানুষ ভারতবর্ষ থেকে তুলা, চাল, কমলালেবু ও লেবুর গাছ নিয়ে গেছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে এগুলির চাষ করেছে।

আরব সাম্রাজ্যের বণিকরা ভারত ও চীনের সঙ্গে ব্যবসা করত। পাহাড় ডিঙিয়ে ও মরুভূমি পেরিয়ে তাদের ঘোড়া ও উট চীন থেকে নিয়ে আসত রেশম ও নানা আসবাবপত্র। ভারতবর্ষ থেকে আসত বস্ত্রসামগ্রী ও দামী পাথর। পশ্চিম ইউরোপে ও ভলগার তীরে আরব বণিকরা প্রাচ্যের নানা দামী জিনিস বিক্রি করত।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারঃ আরব বিজ্ঞানীরা বলতেন জ্ঞানই মানুষের সুন্দরতম অলঙ্কার। সেখানে গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, ভূগোল ও রসায়নবিজ্ঞান খুবই উন্নত অবস্থায় পৌঁছায়। ওমর খৈয়াম তার নিজের যুগে গণিতবিদ রূপেই বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একটি উন্নত ধরনের পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। আরবের গণিতবিদরাই বীজগণিত আবিষ্কার করেন। এল্‌জেবরা কথাটি আরবী ভাষা থেকে এসেছে। দশমিক সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার আরব শিখেছে ভারতবর্ষের কাছ থেকে। ইউরোপ দশমিকের ব্যবহার শিখেছে আরবের কাছ থেকে। পৃথিবীর আকারের হিসাব সম্পর্কে আরবের পণ্ডিতদের ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট ছিল। আরবের কার্পেট, চামড়ার কাজ, সুদৃশ্য তরবারি, রেশম, ধাতু শিল্প ও এনামেল করা কাঁচের জিনিস পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। আরবদেশে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে—"জ্ঞানের অন্বেষণে যারা পৃথিবী ভ্রমণ করে, স্বর্গের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত।" আরব পর্যটকদের বিবরণে আরব সাম্রাজ্যের দেশগুলির নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির খবরও তারা রাখত। তাদের পরিচিত সমস্ত দেশ ও সমুদ্রের মানচিত্র তারা সংকলন করেছিল। একাদশ শতকে মধ্য এশিয়ার ইবন্ সিনা বা আভিসেনা নামে একজন সুপণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ১০০টির

বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। যক্ষ্মা রোগ যে সংক্রামক—এ তত্ত্ব তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। অনেক রোগের বিশদ বিবরণ তিনি প্রকাশ করেছেন।

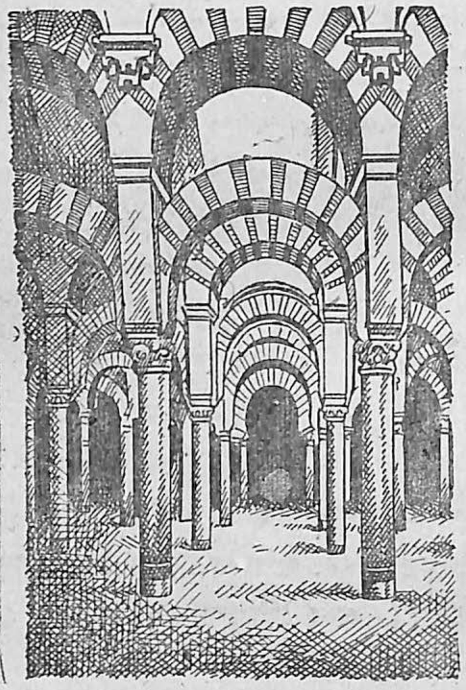
আরবী ভাষার চর্চা ঃ আরব সাম্রাজ্যের অধীনে অনেক প্রাচীন, উন্নত ও সুসভ্য অঞ্চল ছিল। যথা, ঈজিপ্ট, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মধ্য এশিয়া। এই সব সুসভ্য অঞ্চলের সংস্পর্শে এসে আরব সভ্যতা পুষ্ট হয়েছে। ধীরে ধীরে আরবীয়রা বিজিত দেশের সভ্যতা গ্রহণ করেছে। আবার আরবী ভাষার চর্চা ঐ সমস্ত দেশে চালু হয়েছে। আদালতে ও বিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ব্যবহার করা হত। সিরিয়া, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার কবি ও বৈজ্ঞানিক আরবী ভাষাতেই ভাবের কথা ও জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেছেন। বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে আরবী লিপি ও পারসিক ভাষাকে আশ্রয় করে। বণিক ও পর্যটকরা ভারতবর্ষ, পারস্য ও ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশ থেকে শুধুমাত্র মূল্যবান জিনিষ নিয়ে আসেনি, নানা বিষয়ে অনেক মজার গল্পও নিয়ে এসেছিল। খলিফা ও সামন্তপ্রভুদের প্রাসাদে, বোগদাদের পথে-ঘাটে, বাজারে গঞ্জে এই সব চিত্তাকর্ষক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গল্পগুলি নিয়েই পরবর্তীযুগে বিশ্ববিখ্যাত 'আরব্য রজনী' লেখা হয়েছিল। ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ এবং ফেরদৌসির শাহনামা সে যুগে দুটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্থাপত্যবিদ্যা ঃ স্থাপত্যবিদ্যায় আরবীয়রা কুশলী শিল্পী ছিল। খলিফাদের জন্য মনোহর প্রসাদ তারা তৈরী করেছিল। প্রাসাদে থাকত অগণিত ঝর্ণা আর সুরম্য বাগিচা। অনেক সুদৃশ্য মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে জীবিত প্রাণীর চিত্র আঁকা বারণ আছে। তাই মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের কোন ছবি পাওয়া যায় না। এই নিষেধের জন্য আরব সভ্যতায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য খুব বেশী বিকাশ লাভ করে নি।

ইউরোপে আরব সভ্যতার প্রভাব ঃ নানা ভাবে ইউরোপের মানুষ আরবের কাছে ঋণী। পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতরা আরবের

গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদদের কাছ থেকে নির্দেশ নিত। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ আভিসেনার বই পড়ে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেছে। আভিসেনার বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

আরব্য স্পেনের মাধ্যমেই ইউরোপ আরব সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আরব্য স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। কর্ডোভাতে



কর্ডোভার মসজিদ

৫ লক্ষ লোকের বাস ছিল। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি। এখানে নাম করা মুসলমান ও অমুসলমান বিজ্ঞানীরা বক্তৃতা করতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা কর্ডোভাতে পড়তে আসত। বড় বড় গ্রন্থাগারে প্রাচীন মুল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করা হত। প্রতি বছর প্রায় ১৬,০০০ বই অনুবাদ করা হত। কর্ডোভার বড় মসজিদও খুব বিখ্যাত। ১২০০ স্তম্ভের উপর মসজিদের ছাদ নির্মিত হয়েছিল।

কর্ডোভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন আভেরস (খ্রীঃ ১১২৬-৯৮)। যুক্তি দিয়ে তিনি ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থের, এবং কোরাণেরও সমালোচনা করেছেন। আভেরসের রচনার মধ্য দিয়েই আরবের মুসলমানরা, ফ্রাঙ্করা, ইটালীয়রা, গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

স্পেনের মূর মুসলমানরা সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই অগ্রসর ছিল। কোরাণ পড়ত বলে তারা আরবী ভাষা খুব ভালভাবে জানত। তাঁদের পুলিশবাহিনী খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিল। সেখানে মেয়েদেরও খুব সম্মান ছিল। নিজেদের নামে মেয়েরা সম্পত্তি রাখতে পারত। স্পেনের আরব মুসলমানরা ইহুদী ও খ্রীস্টানদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। অনেক মুসলমান সামন্ত ও রাজকর্মচারীর খ্রীস্টান স্ত্রী ছিল।

স্মরণীয় তারিখ
খ্রীঃ ৬২২ হিজরী চান্দ্র অব্দ

অনুশীলনী

১। আরবের জলবায়ু বর্ণনা কর।
২। বেদুইনদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।
৩। আরবের বণিকরা কোন কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত?
৪। আরবে ট্রাইবে ট্রাইবে কি নিয়ে বিবাদ হত?
৫। হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। কোন বছর থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়? এই বছরটি কেন বিখ্যাত।
৭। ইসলামের কয়েকটি প্রধান বাণী উল্লেখ কর।
৮। কোন কোন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে?
৯। আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যে কোন দুটি মূল কারণ উল্লেখ কর।
১০। খলিফা বলতে কি বোঝায়? কোন সময় থেকে খলিফাপদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল?
১১। ওমায়ীদ খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী কোথায় ছিল?

১২। এক খলিফার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ দেখা দিলে, কোথায় কোথায় নতুন খলিফা পদ সৃষ্টি করা হল ?

১৩। আরব সভ্যতার কোন কোন জিনিস পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে ?

১৪। কারা বীজগণিত আবিষ্কার করেন ? ইউরোপ দশমিকের ব্যবহার কোথা থেকে শিখেছে ?

১৫। আভিসেনা সম্বন্ধে কি জান ?

১৬। কিভাবে "আরব্য রজনী" লেখা হয়েছিল ?

১৭। আরব সভ্যতার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিকাশ লাভ করেনি কেন ?

১৮। ইউরোপ আরব সভ্যতার কাছে কেন ঋণী ?

১৯। কর্ডোভা কেন বিখ্যাত ?

২০। আভেরসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। এইসব — মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মক্কানগর।

২। ইসলাম ধর্মে — নেই।

৩। — রাজা ফকির সবাই একই সঙ্গে সমবেত হয়।

৪। পরবর্তীকালে—অভিযান স্পৃহা শক্তি জুগিয়েছে।

৫। ইসলাম ধর্ম আরবদের মহৎ — দিয়েছে, তাদের — সুদৃঢ় করেছে।

৬। — উচ্চ আদর্শ দিয়েই আরব অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী — আবদ্ধ হয়েছিল।

৭। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল —।

৮। বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে — লিপি ও —ভাষাকে আশ্রয় করে।

৯। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত — মানুষ — বই পড়ে চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

১০। — রচনার মধ্য দিয়ে আরবের মুসলমানরা, ফ্রাঙ্করা, ইটালীয়রা গ্রীক পণ্ডিত — চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

(আনুমানিক কাল, ৮০০-১৩০০ খ্রীস্টাব্দ)

ক্যারোলিনজিয়ান বংশের রাজত্ব ফ্রাঙ্কদের ইতিহাসে এক গৌরবময় পর্ব। ফ্রাঙ্ক ইতিহাসে এই বংশের শাসন শুরু করেন রাজা পিপ্পিন। তাঁর পুত্রের নাম চার্লস মার্টেল। ফ্রাঙ্কদের রাজা হিসাবে চার্লস মার্টেল কৃতিত্বের অধিকারী। ৭৩২ সালে তুর্সের যুদ্ধে তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। চার্লস মার্টেলের মৃত্যুর পর ৭৫১ সালে রাজা হন তাঁর পুত্র পিপ্পিন দি শর্ট। তিনিও যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। বোগদাদের খলিফা এবং কনসটানটিনোপলের সম্রাট তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল যে তিনি পোপের আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভ করেছিলেন। তিনিও পোপের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছিলেন। পিপ্পিন দি শর্টের পুত্র শার্লামেন ছিলেন ক্যারোলিনজিয়ান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। শার্লামেন মহামতি চার্লাস নামেও পরিচিত। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশেষত তাঁর পিতা পিপ্পিন দি শর্টের রাজ্যশাসন নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

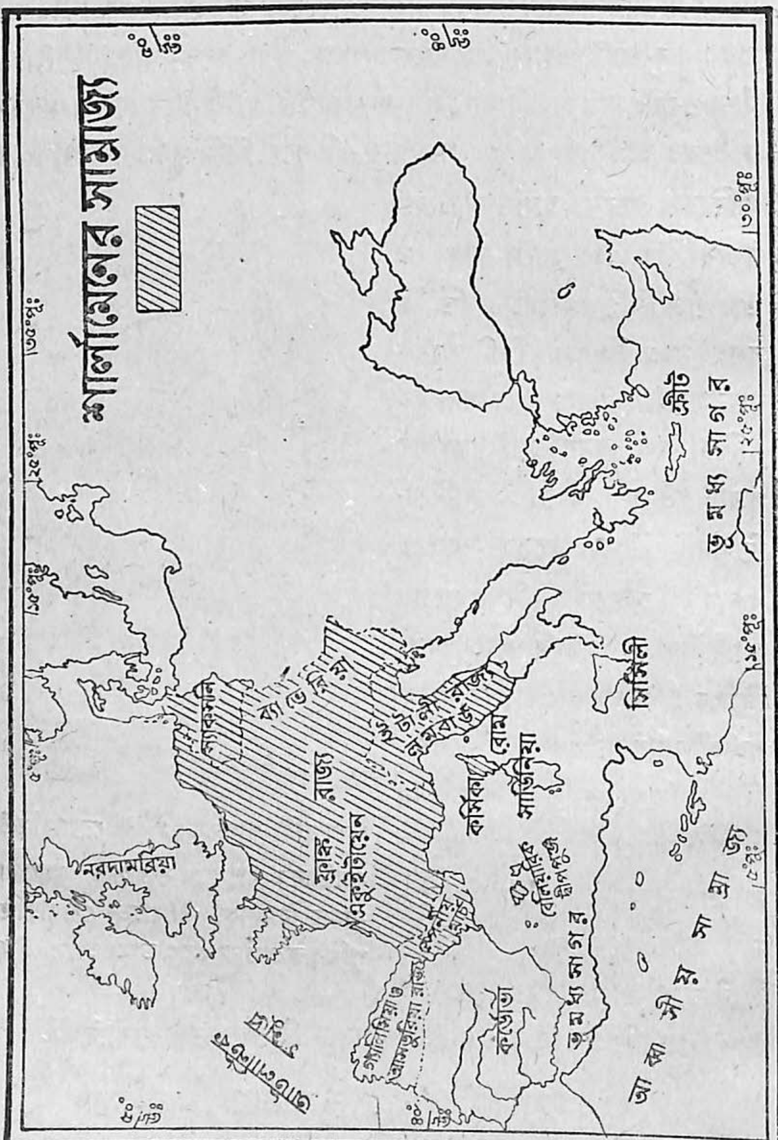


অশ্বারোহী শার্লামেন ঃ এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি প্যারিসের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মাথায় রাজমুকুট বাঁ-হাতে গোলাকৃতি পৃথিবীর প্রতীক এবং ডান হাতে দীর্ঘ তরবারী।

১. শার্লামেন ও পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

চার্লসের রাজ্যবিস্তার ঃ মহামতি চার্লস বা শার্লামেন ৭৭১ সালে ফ্রাঙ্কদের রাজা হলেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি যুদ্ধ

করেছেন। কমপক্ষে ৫৪টি যুদ্ধের কথা ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। লমবার্ড, স্যাক্সন, একুইটায়েন, স্পেন, ব্যাভেরিয়া, ডেনমার্ক



ইত্যাদি শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এইসব যুদ্ধের পিছনে চারটি লক্ষ্য ছিল—(১) সীমান্ত প্রসারিত করা; (২) সীমান্ত

রক্ষা করা, (৩) খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা ; (৪) পোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা।

পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : ৮০০ খ্রীস্টাব্দে শার্লামেন রোমে আসেন। সেখানে সেন্ট পিটারের চার্চে বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে তিনি এসেছিলেন। তখন পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় স্বর্ণ-মুকুট পরিয়ে দিলেন। তাঁকে সম্রাট ও অগাস্টাস সম্বোধন করে পোপ স্বাগত জানালেন। রোমের সম্রাটরূপে শার্লামেনের অভিষেক এইভাবে সম্পন্ন হল। ইতিহাসে এই অভিষেকের ঘটনাটি পশ্চিম রোমে সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবরূপে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হিসাবেও ঘটনাটি স্মরণীয়।

সাম্রাজ্য ও চার্চের মিলন : সমস্ত মধ্যযুগ ধরে দুটি বিরোধী শক্তির খেলা চলছিল। এক দিকে ছিল বিভেদ ও অরাজকতা। অপর দিকে ছিল শান্তি, শৃঙ্খলা ও একতার স্পৃহা। যারা শান্তি শৃঙ্খলা ও একতার স্বপ্ন দেখছিল, অতীতের রোম সাম্রাজ্যের কথা তারা ভাবছিল। শার্লামেনের অভিষেক তাদের কল্পনাকে জীবন্ত রূপ দিয়েছে। তারা ভেবেছে শার্লামেনের মধ্য দিয়েই রোম সাম্রাজ্য ফিরে এসেছে। শার্লামেন নিজেও ভেবেছিলেন যে তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র কনস্টানটাইনের নয় প্রাচীন ইস্রেলের রাজা ডেভিড এবং জোসিয়ারও উত্তরসুরী। ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ছিল শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্লসের আমলে এই সাম্রাজ্য মহৎ নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। সাম্রাজ্য ও চার্চের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। সাম্রাজ্য ও চার্চের মিলনই পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কল্পনায় স্থান পেয়েছে। এই অর্থেই ৮০০ সাল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের জন্মতারিখ রূপে পরিচিত।

শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব : রোম সম্রাট রূপে চার্লসের অভিষেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ বলেছেন এই মধ্যযুগের কেন্দ্রীয় ঘটনা। অনেকে মনে করেন তাঁর অভিষেক থেকেই নতুন যুগ শুরু হল।

বিভিন্ন সভ্যতার মিলন: বাস্তবে তখন সত্যই রোম সাম্রাজ্য ফিরে আসে নি। চার্লস স্বয়ং সত্য সত্যই রোম সম্রাট ছিলেন না। ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ও সত্য সত্যই পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ছিল না। এই হল আসল অবস্থা। কিন্তু একথা স্পষ্ট রোম সভ্যতা, জারমান সভ্যতা এবং খ্রীস্টান সভ্যতার মিলনের পথ সুগম করেছে চার্লসের অভিষেক। ইউরোপের ইতিহাসে এই তিন সভ্যতার মিলন খুবই ফলপ্রসু হয়েছে।

ঐক্য চেতনা: রোম সম্রাটের উপাধি বলে শার্লামেন নতুন রাজ্য পান নি, অতিরিক্ত সেনাবাহিনী পান নি। শুধু পেয়েছেন, ধর্ম রাজ্য ও ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের আদর্শ। ইউরোপের মানুষের মনের গভীরে ঐক্য চেতনা দানা বেঁধেছে। এই ঐক্য চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তী যুগের ইউরোপের কনসার্ট, জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

পোপ ও সম্রাটের সম্পর্ক: শার্লামেন সেণ্ট পিটারের চার্চে এসেছেন। পোপ লিও তাঁর মাথায় স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্রাটরূপে সম্বোধন করলেন। রোম সিনেটের সভ্যরা আনন্দে হাত-তালি দিয়ে উঠল। এই হল ঘটনা। পোপের সঙ্গে সম্রাটের বা পোপতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যের কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী যুগের মানুষরা খুঁজেছে এই ঘটনাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করে।

সম্রাট বিজয়ী যোদ্ধা: যারা মনে করেন সম্রাট সর্ব শক্তিমান, তারা বলেছে সম্রাট স্বর্ণমুকুট পেয়েছে বিজয়ী যোদ্ধা হিসাবে। রাজমুকুট পোপের দান নয়, রোমানদের অনুগ্রহও নয়। সুতরাং সম্রাটের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি।

পোপ ভগবানের প্রতিনিধি: যারা মনে করে পোপ সর্বশক্তিমান তারা বলেছে রাজমুকুট পরিয়েছেন পোপ লিও স্বয়ং। কাকে রাজমুকুট দেওয়া হবে, তার বিচার করবেন স্বয়ং পোপ, ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং সম্রাটের চেয়ে পোপের ক্ষমতা বেশী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পোপ ও সম্রাটের মধ্যে সহযোগিতা ঃ তৎকালীন মানুষরা এই অভিষেকের ঘটনাটিকে ভগবানের নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিল। পোপ বড় না সম্রাট বড় এই সব প্রশ্ন নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি। তাদের কাছে মনে হয়েছিল পোপ ও সম্রাটের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। এটাই স্বাভাবিক, সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। স্বয়ং শার্লামেনও পোপ ও সম্রাটের মধ্যে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

২. শার্লামেনের রাজসভা ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ

রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয় ঃ শার্লামেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদেই তিনি একটি বিদ্যালয় বসিয়ে ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। রাজকর্মচারী ও সামন্ত শ্রেণীর সন্তানরাও এখানে পড়াশুনা করত। এই স্কুলে আচার্য হিসাবে এসেছিলেন নরদামব্রিয়া থেকে **এলকুইন** ও ইটালী থেকে **পল দ্য ডিকন**। স্পেন থেকে এসেছিলেন কবি থিওডুলফ। **পল দ্য** ডিকন লমবার্ডির ইতিহাস লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে লমবার্ডির অনেক লোকগাথা সংরক্ষিত আছে। ব্যাকরণ, বানান, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন ভঙ্গীতে এলকুইন পাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন। আইনহার্ড চার্লসের জীবনী লিখেছিলেন। খ্রীস্টান মতে নানা পাণ্ডু-লিপির প্রতিলিপি হস্তাক্ষরে তৈরি করা হচ্ছিল। এই কাজের জন্য ছোট নতুন ধরনের অক্ষর আবিষ্কার করা হল।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঃ রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য মঠেও বিদ্যালয় ছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। গ্রন্থাগারগুলিতে পাণ্ডুলিপি নকল করা হত ও বিভিন্ন স্থানে সেগুলি বিতরণ করা হত।

সৌধ ও সেতু নির্মাণ ঃ বড় বড় সৌধ নির্মাণের কাজেও চার্লসের অসীম আগ্রহ ছিল। আচেনে তিনি নিজের জন্য সুদৃশ্য প্রাসাদ ও ক্যাথিড্রেল তৈরী করিয়েছিলেন। মেইনজ-এ তিনি পাঁচশ গজ দীর্ঘ একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। রাইন ও ডানিয়ুবের মধ্যে

যোগাযোগের জন্য শার্লামেন একটি খাল খনন করিয়েছিলেন। চার্লসের উৎসাহে স্থপতি বিদ্যা খুবই উন্নতি লাভ করেছিল।

৩. ধর্মসংঘের কথা

সেণ্ট বেনেডিক্ট ঃ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ধর্মসংঘের সন্ন্যাসী গোষ্ঠী। সন্ন্যাসীদের কাজের জন্যই খ্রীস্টান ধর্মসংঘগুলি মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। খ্রীস্টান ধর্মসংঘগুলি চতুর্থ শতকে মিশরের দক্ষিণে সর্ব-প্রথম হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু খ্রীস্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ধর্মসংঘগুলি এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ইউরোপে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়। তাদের কাজকে ঠিক ঠিক ভাবে চালনা করার জন্য কিছু নিয়মকানুনের প্রয়োজন হল। সেণ্ট বেনেডিক্ট (খ্রীঃ ৪৮০-৫৪৩) তখন মন্টি ক্যাসিনোর ধর্মসংঘের প্রধান। এই ধর্মসংঘটির পরিচালনার জন্য তিনি কিছু নিয়মকানুন তৈরি করলেন। পশ্চিম ইউরোপের সব ধর্মসংঘগুলিই সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুনগুলি গ্রহণ করেছিল।

গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্য ঃ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে বেনেডিক্টের জীবনের খুব মিল পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের মত তিনিও প্রথম জীবনে উপবাস করতেন, দেহকে নানা কষ্ট দিয়ে সাধনা করতেন। গৌতম বুদ্ধের মত তিনি বুঝতে পারলেন কৃচ্ছ্রসাধনা অর্থহীন। এক-জন সাধু একটি নির্জন গুহায় পাথরের সঙ্গে লোহার শৃঙ্খল দিয়ে নিজেকে বেঁধে সাধনা করতেন। সেই সাধুকে সেণ্ট বেনেডিক্ট বলে-ছিলেন "শৃঙ্খল চূর্ণ কর, ভগবানের প্রকৃত সেবক পাথরের সঙ্গে লোহার শিকলে নিজেকে বাঁধেন না ; ন্যায়পরায়ণতার শিকল দিয়ে প্রভু যীশুর সঙ্গে নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেন।"

ধর্মসংঘের জীবনযাত্রা ঃ সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুনে সংঘগুলি সুশাসিত ছিল, সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল ছিল। প্রত্যেক

সংঘের প্রধান অ্যাবট নামে পরিচিত। তিনি সেই সংঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তাঁর আদেশ পালন করা সন্ন্যাসীদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। প্রতিটি সন্নাসীকে দারিদ্র্য, পবিত্রতা ও আনুগত্যের শপথ নিতে হত। সে দরিদ্র জীবন যাপন করবে, সে পবিত্র জীবন যাপন করবে, সে সংঘের প্রতি অনুগত থাকবে। তারা বিবাহ করতে পারবে না। নিজস্ব সম্পত্তি রাখতে পারবে না। অলস জীবন যাপন করতে পারবে না। নিরন্তর প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা সংঘের সন্নাসীদের জন্য রান্না করতেন, ঘরদোর পরিষ্কার রাখতেন, চাষবাস করতেন। তাঁরা নিজেরা লেখাপড়া করতেন, অন্যকে লেখাপড়া শেখাতেন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির প্রতিলিপি তৈরি করতেন।



খ্রীস্টান সন্ন্যাসী
অনাড়ম্বর পোশাক দারিদ্র্য ও পবিত্রতার প্রতীক

সাবলম্বী সংঘ ঃ সন্ন্যাসীদের জীবন আরামের ছিল না, আবার কঠোরও ছিল না। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্রের উপযুক্ত সরবরাহ ছিল বিশ্রামেরও সুযোগ ছিল। সংঘগুলি স্বাবলম্বী ছিল। তাদের ফুল ও ফলের বাগান, কারখানা, মাছ ভর্তি পুকুর, শস্যের ক্ষেত—সবই ছিল। তা ছাড়া রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ছিল। তীর্থযাত্রী ও দরিদ্রলোকের জন্য অতিথিশালা ছিল। বড় বড় সংঘে রাজা ও সামন্ত প্রভুদের জন্য বিশেষ আবাসগৃহ ছিল।

ধর্মসংঘের অবদান ঃ বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসীদের অবদান ছিল অপরিমেয়। তাঁদের মধ্য থেকে ২৪ জন পোপ এবং পাঁচ হাজার আর্চবিশপ ও বিশপ বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সহস্র লেখক জন্ম নিয়েছেন। এঁদের অনেকেই খ্যাতনামা। ইংলণ্ডের চার্চের ইতিহাসে লেখক বীড (খ্রী: ৬৭৩—৭৩৫) ছিলেন একজন বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসী। এই সংঘের সন্ন্যাসী সেণ্ট অগাস্টাইন ইংলণ্ডে খ্রীস্টধর্ম

প্রচার করেছিলেন। অন্যান্য সন্নাসীরা হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া ও স্ক্যানডেনেভিয়া অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। তারা জঙ্গল কেটেছে, জলাভূমি পরিষ্কার করেছে, পতিত জমি চাষ করেছে, অশান্ত নদীকে বাঁধ দিয়ে বেঁধেছে। ইউরোপের সর্বত্রই যখন বিশৃঙ্খলা চলছে একমাত্র সংঘগুলিতে তখন শৃঙ্খলা ছিল। কি চাষের ক্ষেতে কি কাঁচ শিল্পে সর্বত্রই তাদের নিপুণ সংগঠন ছিল। সংঘের শৃঙ্খলাবোধ ও সংগঠনশক্তি সত্যই অনুকরণীয়। ভিক্ষাদানের ব্যাপক আয়োজন ছিল, ফলে অনেক দুঃখী দরিদ্র মানুষ অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সে যুগে লেখাপড়ার সমাদর সাধারণ মানুষ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তখন শুধুমাত্র বেনেডিক্টীয় সংঘ-গুলিতে বিদ্যাচর্চা হত। সংঘের পাঠাগারে গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সাজান ছিল। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র তখন আতঙ্ক ও অশান্তি। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে একমাত্র সংঘগুলিতেই জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সুন্দর ও নিরাপদ। একমাত্র সংঘগুলিতেই অগণিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আয়োজন ছিল। পাণ্ডুলিপিতে সুন্দর অলঙ্করণ করত শিল্পী সন্ন্যাসীরা।

৪. চার্চের অধোগতি ঃ ধর্মসংস্কারের চেষ্টা

ধর্মজগতে লোভ ও স্বার্থপরতা ঃ দশম ও একাদশ শতকের অনেকাংশ জুড়ে ধর্মজগতের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। কারণ হল সম্রাট, রাজা ও সামন্ত প্রভুরা কে পোপ হবেন বা হবেন না তা নিয়ে খুবই মাথা ঘামাত। রাজনীতি, স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ ধর্মজীবনকে কলুষিত করে তুলল। লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে বা অন্য উপায়ে অনেক লোক চার্চের নানা কাজে যোগ দিয়েছিল। এইসব লোকের নীতিজ্ঞান ছিল না, ধর্মজ্ঞান ছিল না, ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ছিল না। ধর্মের নাম করে তারা রাশি রাশি টাকা রোজগার করছিল, ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছিল।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঃ চার্চের সন্ন্যাসীরা বিয়ে করে সংসার

জীবন যাপন করছিল। সামন্ত প্রভুরা যেমন ভাবত যে তাদের সন্তান-সন্ততিরা জমিজমা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তেমনি চার্চের সন্ন্যাসীরাও ভাবত যে তাদের সন্তানসন্ততিরা তাদের সম্পত্তির অধিকারী হবে।

চার্চের পদগুলির কেনাবেচা ঃ আর একটি মন্দ প্রথাও চালু হয়েছিল, তা হচ্ছে চার্চের পদগুলির বেচাকেনা। সামন্ততন্ত্র চার্চের কাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল। মঠগুলির অ্যাবট ও চার্চের বিশপরা শক্তিশালী সামন্ত প্রভুদের ভ্যাসালে পরিণত হয়েছিল। অ্যাবট বা বিশপ মারা গেলে বা অন্য কোন কারণে এ সব পদ শূন্য হলে সামন্ত প্রভু নিজের মনোমত লোককে এসব পদে বসাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তাই টাকার বিনিময়ে অ্যাবট বা বিশপ পদে অনেক অপদার্থ লোক নিয়োগ করা হয়েছিল।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন ঃ মঠ ও গীর্জার এই সমস্ত অনাচার দূর করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডীতে অবস্থিত ক্লুনির মঠ। এই মঠ ৯১০ খ্রীস্টাব্দে ক্লুনিতে স্থাপিত হয়েছিল। এখানকার মঠবাসীদের আদর্শ ছিল সাধু বেনেডিক্টের পবিত্র সন্ন্যাসব্রতের অনুরূপ। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠ জীবনের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সংস্কারমূলক কাজে অগ্রণী হলেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরীও ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের আদর্শে মঠ ও গীর্জার কুপ্রথা দূর করতে চেয়েছিলেন।

গ্রেগরীর সংস্কার নির্দেশ ঃ পোপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের বিবাহ নিষেধ করে দিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে অ্যাবট ও বিশপরা রাজা, সম্রাট ও সামন্ত প্রভুদের কাছ থেকে ক্ষমতার প্রতীক দণ্ড গ্রহণ করতে পারবে না। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন নামে খ্যাত।

সংস্কার অমান্য করলে শাস্তিবিধান ঃ এই সব নির্দেশ অমান্য করলে পোপের হাতে দুটি অস্ত্র ছিল। কোন ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করলে তাকে বহিষ্কার আদেশ (excommunication) দেওয়া হত।

সেক্ষেত্রে স্বজনের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। কোন রাজা বা সম্রাট নির্দেশ অমান্য করলে, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতি নির্দেশ (Interdict) জারী করা হত। সমাজচ্যুতি নির্দেশ কোন নগর, প্রদেশ বা রাজ্যের বিরুদ্ধে জারী করা যেত। তাহলে সেখানকার সমস্ত চার্চ বন্ধ হয়ে যেত। সেখানে সে সময় কোন বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত না, সমাধিক্ষেত্রেও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত না।

৫. জারমান সম্রাটের সঙ্গে পোপের বিরোধ

জারমান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর (খ্রীঃ ১০৫৬-১১০৬) সঙ্গে পোপের বিরোধ বাঁধল। গ্রেগরী সম্রাটের বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ জারী করলেন। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন পোপ সম্রাটের বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ জারী করলেন। ক্যানোসা নামক স্থানে হেনরী গ্রেগরীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এলেন। তিন দিন ধরে সম্রাটকে পোপ দর্শন দিলেন না। চতুর্থ দিনে পোপ দর্শন দিলেন এবং বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন (১০৭৭)।

তারপর হেনরী প্রতিহিংসায় মেতে উঠলেন। সসৈন্যে তিনি রোমে এলেন। তাঁর তাণ্ডব লীলায় রোম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। পোপ গ্রেগরী স্যালারনো পালিয়ে এলেন, তিনি সেখানে ১০৮৫ সালে মারা যান। কিন্তু বিবাদ থামল না। গ্রেগরীর পরবর্তী পোপ হেনরীর বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ দিলেন। হেনরী ভগ্নহৃদয়ে ১১০৬ সালে মারা গেলেন, কিন্তু পাঁচ বছর তাঁর মৃতদেহ পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে কবরস্থ হয়নি। চার্চের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হলে উপযুক্ত মর্যাদায় তা সমাধিস্থ হয়।

ওয়ার্মসের চুক্তি (১১২২): এই চুক্তিতে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হল। সমস্ত বিশপ ও অ্যাবট, চার্চের নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের পর তারা পোপের কাছ থেকে ধর্মীয় ক্ষমতার প্রতীকরূপে অঙ্গুরীয় ও দণ্ড গ্রহণ করবেন। কিন্তু সম্রাট অধিষ্ঠিতকরণ (Investiture) উৎসবে রাজদণ্ড স্পর্শ করাবেন।

রাজদণ্ড হল রাজক্ষমতার প্রতীক। ওয়ার্মসের চুক্তিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে চার্চ হল ধর্মীয় শক্তির উৎস, সম্রাট হল রাজশক্তির উৎস। আপাতত মনে হতে পারে এই চুক্তি নিছক একটি আপস রফামাত্র, কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করলে মনে হবে পোপেরই জয় হয়েছে। কারণ এই চুক্তি না হলে পোপের ক্ষমতা রাজশক্তির দাপটে হয়ত লুপ্ত হয়ে যেত। এই বিপদ থেকে চার্চ রক্ষা পেল।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব

এখন যেমন শ্রমিকরা মিলিত হয়ে গড়ে ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্ররা মিলিত হয়ে গড়ে ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষকরা মিলিত হয়ে গড়ে শিক্ষক সমিতি মধ্য যুগেও তেমনি শিক্ষকরা সম্মিলিত হয়ে সংগঠন গড়ত। এই সমস্ত সংগঠনগুলি গিল্ড নামে বেশি পরিচিত। মধ্যযুগে গিল্ড-গুলিকে বলা হত ইউনিভারসিটাস (universitas)। সবরকমের যৌথ সংগঠনকে ইউনিভারসিটাস নামে অভিহিত করা হত। ল্যাটিন ইউনিভারসিটাস থেকে ইংরেজী ইউনিভারসিটি কথাটা এসেছে। ইউনিভারসিটি বাংলা ভাষায় আমরা বলি বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা যাকে বলি বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগের ইউরোপে তা ল্যাটিন ভাষায় স্টাডিয়াম জেনারেল (Studium generale) নামে পরিচিত ছিল।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান: দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

১। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়: এখানে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র পড়ান হত।

২। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়: এখানেও ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র পড়ান হত।

৩। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়: এখানে আইন পড়ান হত।

৪। স্যালারনো বিশ্ববিদ্যালয়: এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ান হত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ দেশের নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

যে কোন দেশের ছাত্রকে আইন পড়তে হলে তাকে বোলোনা যেতেই হত। ঠিক তেমনি, যে কোন দেশের ছাত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে হলে তাকে স্যালারনো যেতেই হত। এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশের ছাত্ররা এসে সমবেত হত।

তুজন বরণীয় পণ্ডিত ঃ মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে দু'জন পণ্ডিতের নাম চিরস্মরণীয়। তারা হলেন এবেলার্ড (খ্রীঃ ১০৭৯-১১৪২) ও সেণ্ট টমাস একুইরাস (খ্রীঃ ১২২৭-১২৭৪)। এবেলার্ড গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের তর্কবিদ্যা খুব ভাল করে পড়েছিলেন। ধর্ম-শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা তিনি মানতে পারেন নি। তিনি এগুলিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতেন। প্রায় আধুনিক বিতর্কের পদ্ধতিতে সব কিছুর চুলচেরা বিচার করতেন, প্রতিটি বক্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাতেন। এসব থেকে ছাত্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলতেন, তিনি বলতেন, "অবিরাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই হল জ্ঞানের চাবিকাঠি।"

সেণ্ট টমাস একুইনাস ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তার শ্রেষ্ঠ বই-এর নাম হল 'সামা থিওলজিকা (Summa Theologica) চার্চের প্রচারিত নীতির প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে বিচার করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন।

৭. **পাঠ্যসূচী ঃ** পশ্চিম ইউরোপের চার্চ ও মঠের বিদ্যালয়গুলিতে রোমান শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিদ্যালয়গুলিতে নিচু ক্লাসে পড়ান হত ব্যাকরণ, অঙ্ক, সঙ্গীত। উঁচু ক্লাসে পড়ান হত অলঙ্কার, সাহিত্য, কিছু আইন ও দর্শন। তারপর পাঠ্যসূচীতে ৭টি কলা স্থান পেল যথা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা, অঙ্ক,জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত। প্রথম তিনটিকে বলা হত মানবিক বিদ্যা, পরের চারটিকে বলা হত বৈজ্ঞানিক বিদ্যা।

দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল।

১। ব্যাকরণের সঙ্গে যুক্ত হল রোমান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি।

২। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের লেখার সমাদর বাড়ল।

৩। গণিত মানে বোঝান হল অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা।

৪। আইন বিদ্যার মধ্যে রোমের আইনকে বড় স্থান দেওয়া হল।

৫। ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের চর্চাকে খুবই সম্মান দেওয়া হল।

৬। এই পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হল। পরে পেশাগত বিদ্যা হিসাবে ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও আইন যুক্ত হল।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আকর্ষণ খুব কম ছিল। চাকুরী বা পেশার জন্য যেটুকু লেখাপড়া দরকার তার বেশি জ্ঞানচর্চা কেউ করতে চাইত না। জানার ব্যাকুলতা নিয়ে আনন্দের জন্য কেউ লেখাপড়া করত না। মধ্যযুগের শেষের দিকে জ্ঞানচর্চা বাড়ল। কারণ সমাজে তখন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির মানসম্মান বেড়ে গিয়েছিল।

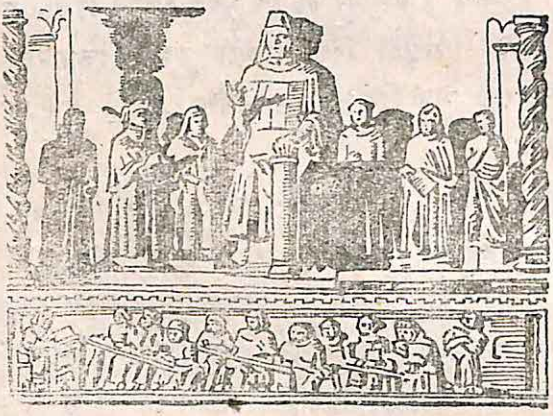
৮. বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন যাত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে পাশ করত, তাদের সর্বত্রই শিক্ষকতা করার অধিকার ছিল। বি. এ. পাশ করতে হলে ৪/৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হত। এই পড়াশুনা হত মূলত তিনটি পেশাদারী বিদ্যায়—আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র। এম. এ. পাশ করতে হলে বা ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে হলে আরও ৩/৪ বছর পড়তে হত। প্যারিসে ধর্মশাস্ত্রে ডক্টরেট হতে গেলে কমপক্ষে ৮ বছর সময় লাগত, পরে বাড়তে বাড়তে তা ১৪ বছরে দাঁড়ায়।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক: পাশ করলে শিক্ষকদের সম্মানে একটি ভোজের অনুষ্ঠান হত। ভোজের খরচ বহন করত ছাত্ররা। ছাত্রদের প্রতিজ্ঞা করতে হত যে ফেল করলে তারা ছোরা বা ছুরি দিয়ে শিক্ষকদের আক্রমণ করবে না।

প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব ঘরবাড়ি ছিল না। ক্লাস বসত চার্চ বা ক্যাথিড্রেল ভবনে। কখনও কখনও শিক্ষকরা নিজেরাই

ক্লাসের জন্য ঘর ভাড়া করতেন। শিক্ষকদের হয়ত ডেস্ক ছিল, কিন্তু ছাত্রদের মেজেতেই বসতে হত। ছাত্ররা এত হৈ হট্টগোল করত যে প্রায়ই শিক্ষকদের কাছ থেকে বকুনি খেতে হত। লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। এমন কি সামাজিক মেলামেশার সময়ও ছাত্ররা



ইতালীর একটি মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়; ক্লাস-এ অধ্যাপক পড়াচ্ছেন

যতদূর সম্ভব ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা চালাত। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষকরা বক্তৃতা করে পাঠ বোঝাতেন।

ছাত্রদের সামাজিক জীবন : বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শৃঙ্খলা ছিল না বললেই চলে। ছাত্ররা অধিকাংশ ছিল উচ্ছৃঙ্খল। বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে শহরের নাগরিকদের নিত্যই বিরোধ লেগে থাকত। ছাত্ররা প্রচুর অর্থব্যয় করত বলে নাগরিকরা তাদের সহ্য করে যেত। কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ছাত্ররা খুবই অসহিষ্ণু ছিল। নানা সুযোগ সুবিধার তারা অপব্যবহার করত। অশালীন আচরণের জন্য তাদের খুবই নিন্দাবাদ শুনতে হত।

এসব সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুনিশ্চিত অবদান ছিল। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন চেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বহু কষ্ট সহ্য করে বহু বাধা অতিক্রম করে অনেক ছাত্র জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেছিল।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ ৮০০ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
খ্রীঃ ১১২২ ওয়ার্মসের চুক্তি।

অনুশীলনী

১। শার্লামেনের যুদ্ধগুলির পিছনে কি কি লক্ষ্য ছিল ?

২। কোন ঘটনাকে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠারূপে স্মরণ করা হয় ?

৩। শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। সম্রাট ও পোপের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি ? যারা বলেন সম্রাটের ক্ষমতা বেশি, তাদের যুক্তি কি ছিল ? যারা বলেন পোপের ক্ষমতা বেশি তাদের যুক্তি কি ছিল ?

৫। শার্লামেনের রাজ প্রাসাদের বিদ্যালয়ে যে সব আচার্য ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

৬। পল দ্য ডিকন, আইনহার্ড এবং এলকুইন কেন বিখ্যাত ?

৭। শার্লামেনের আমলে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কি কাজ করা হত ?

৮। শার্লামেন আচেনে কি কি সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন ?

৯। কবে এবং কোথায় সর্বপ্রথম খ্রীস্টান ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ?

১০। সেণ্ট বেনেডিক্ট কে ছিলেন ? অল্প কথায় তাঁর পরিচয় দাও।

১১। সেণ্ট বেনেডিক্টের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোথায় কোথায় মিল পাওয়া যায় ?

১২। ধর্মসংঘের প্রধান কি নামে পরিচিত ছিলেন ?

১৩। ধর্মসংঘের সন্ন্যাসীদের কি কি শপথ নিতে হত ?

১৪। ধর্মসংঘের সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় দাও।

১৫। বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের নাম কর।

১৬। মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মসংঘের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭। দশম ও একাদশ শতকে চার্চের সংগঠনে কি কি কু-প্রথা চালু হয়েছিল ?

১৮। চার্চের পদগুলি কিভাবে বেচাকেনা করা হত ?

১৯। পোপ সপ্তম গ্রেগরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২০। চার্চের সংস্কারের জন্য পোপ গ্রেগরী কি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ?

২১। বহিষ্কার আদেশ ও সমাজচ্যুতি নির্দেশ কার কার বিরুদ্ধে জারী করা হত ?

২২। জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে পোপ গ্রেগরীর বিরোধ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২৩। ওয়ার্মসের চুক্তির সিদ্ধান্ত উল্লেখ কর। এই চুক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর।

২৪। মধ্যযুগে গিল্ড বলতে কি বোঝানো হত ?

২৫। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলা হত কেন ?

২৬। এবেলার্ড ও একুইনাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২৭। মধ্যযুগে চার্চ ও মঠের বিদ্যালয়ে নিচু ক্লাসে ও উঁচু ক্লাসে কি কি বিষয় পড়ান হত ?

২৮। মধ্যযুগে মানবিক বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বলতে কি কি বিষয় বোঝান হত ?

২৯। দ্বাদশ শতকে পাঠ্যসূচীতে কি কি পরিবর্তন দেখা দিল ?

৩০। মধ্যযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩১। মধ্যযুগে ছাত্রদের সামাজিক জীবনের পরিচয় দাও।

৩২। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি অবদান ছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। সাম্রাজ্য ও চার্চের — পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কল্পনায় স্থান পেয়েছে।

২। স্বয়ং শার্লামেন পোপ ও সম্রাটের মধ্যে — নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩। রাইন ও — মধ্যে যোগাযোগের জন্য শার্লামেন একটি — খনন করেছিলেন।

৪। এই সংঘের সন্ন্যাসী সেণ্ট — ইংলণ্ডে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন।

৫। সংঘের — ও সংগঠন শক্তি সত্যিই অনুকরণীয়।

৬। একমাত্র সংঘগুলিতেই অগণিত — সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আয়োজন ছিল।

৭। — চুক্তিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে চার্চ হল — শক্তির উৎস, সম্রাট হল রাজ শক্তি —।

৮। জানার — নিয়ে — জন্য কেউ লেখাপড়া করত না।

৯। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন —ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

১. সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সামন্ততান্ত্রিক যুগ ঃ ইউরোপে আনুমানিক ৮০০ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত যে যুগ, তা সামন্ততন্ত্রের যুগ নামে খ্যাত। ৮০০ সালের আগে সামন্ততন্ত্রের লক্ষণগুলি ইউরোপের কিছু কিছু জায়গায় ছিল। ১৩০০ সালের পরেও সামন্ততন্ত্র কোন না কোন ভাবে ইউরোপের নানা অঞ্চলে টিঁকে ছিল। কিন্তু এই ৫০০ বছরে ইউরোপের ইতিহাসের মূলকথা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। তাই এই যুগের নাম সামন্ততান্ত্রিক যুগ। সামন্ততন্ত্র এক ধরনের ভুমি ব্যবস্থা। যিনি জমির মালিক তাকে বলা হত **সামন্ত প্রভু**। অন্য আর একজনকে এই জমি দেওয়া হত ভোগ করার জন্য। তাকে বলা হত ভ্যাসাল। সামন্ত প্রভু ও ভ্যসালের মধ্যে ছিল জমিকে কেন্দ্র করে এক চুক্তির সম্পর্ক। ভ্যাসালকে বহু রকম কর্তব্য পালন করতে হত। সামন্তপ্রভুর সৈন্যবাহিনীতে সেনা হিসাবে যোগ দিয়ে তাদের যুদ্ধ করতে হত। কখনো বা সেনা জোগাতে হত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও সামন্তপ্রভুকে সাহায্য করতে হত।

আগে রাজাদের হাতে ছিল অবাধ শাসন ক্ষমতা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে সমান্তপ্রভুদের হাতে এসে গেল অবাধ শাসন ক্ষমতা। শক্তিশালী সামন্তপ্রভুরা কখনো সোজাসুজি দুর্বল রাজাদের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, কখনও বা রাজারা নিজেরা দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্তপ্রভুদের হাতে শাসনের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সামন্তপ্রভুরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, শক্ত হাতে নিজের নিজের অঞ্চলকে শাসনে রেখেছে। সামন্ততন্ত্র তাই এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে এক একজন সামন্তপ্রভু ব্যক্তিগতভাবে সরকারী কাজ চালাত এবং দেশ শাসনের কাজ করত।

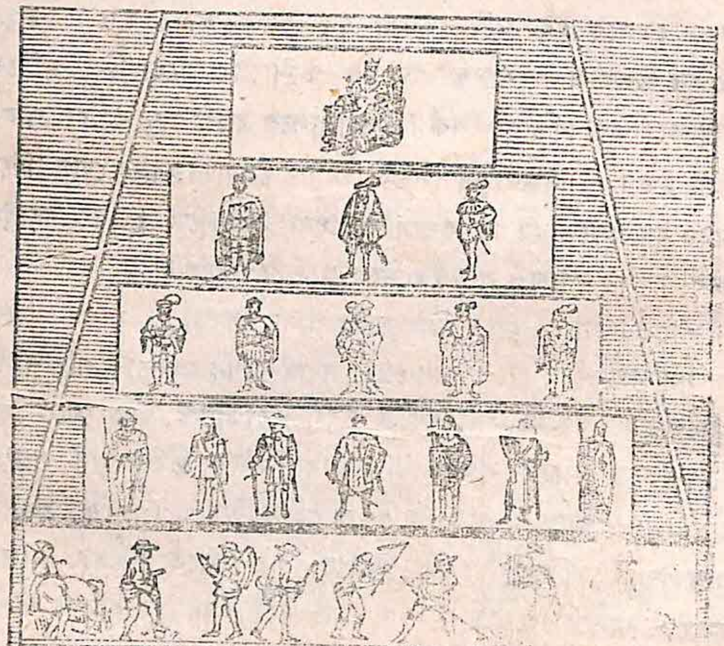
একটি অনুষ্ঠানে ভ্যাসাল প্রতিজ্ঞা করত যে সে সামন্তপ্রভুর প্রতি অনুগত হয়ে থাকবে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক

শাসনকাঠামো, এ আনুগত্যের সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়েছিল। এই আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি নয়, ব্যক্তির প্রতি।

সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ছিল। এই বন্ধনের অর্থ হল আপদে বিপদে প্রভু ভ্যাসালকে রক্ষা করবে। বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে, দেশের ভিতরের অরাজকতার হাত থেকেও বাঁচাবে। ভ্যাসাল প্রভুকে আপদে বিপদে রক্ষা করবে, প্রভুর হয়ে কাজ করবে, প্রভুর প্রতি অনুগত থাকবে।

২. সামন্ততান্ত্রিক সমাজে স্তর বিভাগ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নানা স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মানুষের মানমর্যাদা নির্ভর করত, সে সমাজের কোন স্তরে আছে, তার উপর।



সামন্ততান্ত্রিক সমাজে স্তর বিভাগ

সমাজের শীর্ষে ছিলেন রাজা। আইনের চোখে দেশের যাবতীয় জমির মালিক স্বয়ং রাজা। রাজা ছিলেন জমিদারদের প্রধান।

তিনি জমিজমা সামন্তপ্রভুদের বণ্টন করে দিতেন। এই সামন্তপ্রভুরা ডিউক এবং আর্ল নামে পরিচিত। ডিউক ও আর্ল তাদের জমির কিয়দংশ অধস্তন সামন্তপ্রভুদের বণ্টন করে দিতেন। এই অধস্তন সামন্তপ্রভুরা ব্যারণ নামে পরিচিত। ব্যারনরা ডিউক এবং আর্লদের সামরিক সাহায্য দিতেন। ডিউক ও আর্লরা রাজার ভ্যাসাল। তারা ছিলেন রাজার প্রতি অনুগত। ব্যারনরা ডিউক ও আর্লদের ভ্যাসাল। ব্যারনরা সরাসরি ডিউক ও আর্লদের প্রতি অনুগত। ব্যারনদের নিচে ছিল সামন্তশ্রেণীর যে অংশ তাদের নাইট বলা হত। নাইটরা ব্যারনদের ভ্যাসাল। নাইটরা ব্যারনদের সামরিক সাহায্য দিতেন। নাইটদের কোন ভ্যাসাল ছিল না।

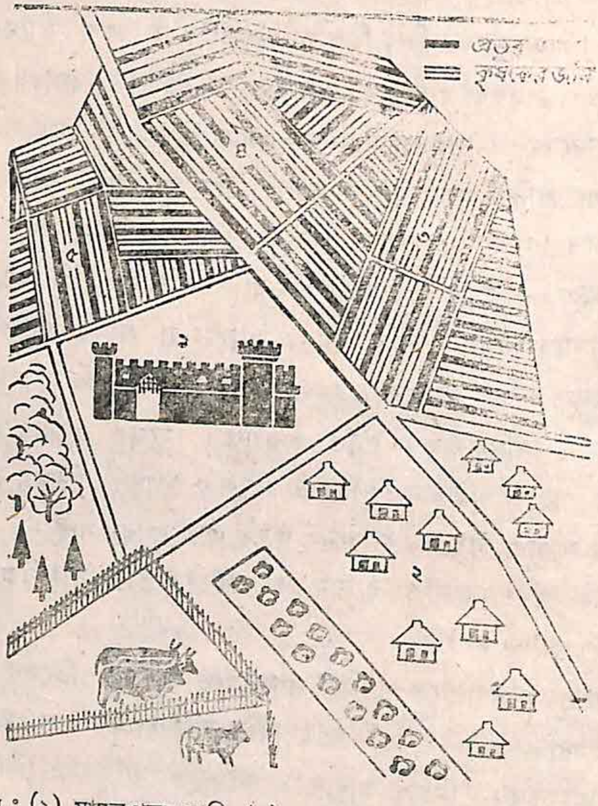
সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে নিচের স্তরে ছিল অগণিত সার্ফ কৃষককুল। সার্ফ কৃষককুলের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন-ধারণ করতেন রাজা ও সামন্তপ্রভুরা। সার্ফরা দাস নয়, কারণ তারা সামন্তপ্রভুদের সম্পত্তি নয়। ভ্যাসালরা জমির মালিক নয়। সামন্তপ্রভুর জমি তারা ভোগ দখল করত। ভ্যাসাল একান্তভাবেই তার নিজস্ব সামন্তপ্রভুর প্রতি অনুগত। যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজা সামরিক সাহায্য চাইতেন ডিউক ও আর্লের কাছে। ডিউক ও আর্ল সামরিক সাহায্য চাইতেন ব্যারনের কাছে এবং ব্যারন নাইটের কাছে। এমন কি স্বয়ং রাজাও ব্যারন ও নাইটের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতে পারতেন না।

নিজস্ব জমিদারীতে প্রতিটি সামন্তপ্রভু সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁর নিজস্ব সেনাদল ছিল। তিনি জমিদারীর বাসিন্দাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। নিজস্ব আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি স্বয়ং বিচার করতেন এবং প্রয়োজন হলে শাস্তি দিতেন।

সমাজের এই স্তর বিভাগ বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল। সামন্তপ্রভু মারা গেলে তার স্থান দখল করত তাঁর বড় ছেলে। পিতার মত সেও পিতার ভ্যাসালদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ দাবী করত। সামন্তপ্রভুর ছেলে হত সামন্তপ্রভু, ভ্যাসালের ছেলে হত ভ্যাসাল।

৩. সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রা

নবম দশম শতকে পশ্চিম ইউরোপের যাবতীয় জমিজমা বড় বড় ভূস্বামীদের হাতে এসে পড়েছিল। মাঠঘাট, বনজঙ্গল, পতিতজমি সবকিছুই তাদের সম্পত্তি ছিল। অনেক জমিজমার উপর সার্ফরা বসবাস করত। সার্ফসহ এইসব জমিজমা ফিউড নামে পরিচিত। এই জমিজমা ও সার্ফদের মালিক ছিল সামন্তপ্রভু। কখনো দশবিশ,



ম্যানর : (১) সামন্তপ্রভুর বাড়ি (২) কৃষকদের কুটির (৩) শীতকালে আবাদ যোগ্য জমি (৪) পতিত জমি (৫) বসন্তকালে আবাদ যোগ্য জমি।

কখনো একশ গ্রাম একজন সামন্তপ্রভুর অধীনে থাকত। কখনো সামন্তপ্রভুদের অধীনস্থ গ্রামগুলি দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। তাঁর ভূসম্পত্তির মধ্যস্থলে থাকত সামন্তপ্রভুর ম্যানর। এই ম্যানরকে চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হত। সামন্তপ্রভুর বাড়ি,

তার চাকর-বাকরদের বাড়ি, শস্যাগার, আস্তাবল, মুরগি পোষার ঘর থাকত এই বেড়াঘেরা অঞ্চলে। কখনো কখনো থাকত ফলের বাগান, শাকসব্জীর বাগান।

ম্যানরের চারপাশে যে গ্রাম থাকত, সার্ফরা সেই সব গ্রামে বসবাস করত। ভূসম্পত্তির মধ্যে যে চাষযোগ্য জমি থাকত, তাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। (১) প্রভুর নিজস্ব জমি। (২) কৃষকের জন্য বরাদ্দ জমি। সামন্তপ্রভুর জমির শস্য তার নিজস্ব গোলাঘরে উঠত। প্রতিটি সার্ফ তার নিজের বরাদ্দ জমি চাষ করত। বনজঙ্গল, মাঠঘাট, পুকুর, নদী—এসব কিছুই ছিল সামন্তপ্রভুর সম্পত্তি। সার্ফ কৃষক শ্রেণী এগুলি অবশ্য ব্যবহার করতে পারত। চাষ করার জন্য সার্ফের নিজের জমি ছিল, নিজস্ব হাতিয়ার ছিল, পশুযূথ ছিল, বসবাসের জন্য কুটির ছিল। নিজের জমিতে চাষ করে সার্ফ নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করত। নিজের ঘোড়া, লাঙল ও হাতিয়ার দিয়ে নিজের ও সামন্তপ্রভুর জমি চাষ করত।

লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল তোলা, ফসল মাড়াই করা এবং গোলাঘরে পৌঁছে দেওয়া এসব কিছু কৃষককেই করতে হত। সামন্ত-প্রভুর জমিতে কাজ করতে করতে অনেক সময়ই সে নিজের জমিতে কাজ করতে পারত না। ঝড়ে বৃষ্টিতে তার নিজের জমির ফসল নষ্ট হত। বেগার খেটেই সার্ফদের জীবন কাটত। বিনা মজুরিতে সামন্তপ্রভুর নানা কাজ তাকে করতে হত। যেমন, প্রভুর বাড়ি গোলাঘর তৈরি করা, তা সংস্কার করা, প্রভুর পুকুর পরিষ্কার করা, তাঁর মাছ ধরা। কৃষকের বৌ মেয়ে প্রভুর পরিবারের জন্য জামাকাপড় বুনে দিত; বাচ্চারা প্রভুর বাগান থেকে ফলমূল তুলে দিত। নিজেদের ভাগ থেকে কৃষকরা প্রভুর জন্য শস্য, হাঁস, মুরগি, ডিম, মধু, মাখন, সুতো, চামড়া ইত্যাদি সরবরাহ করত।

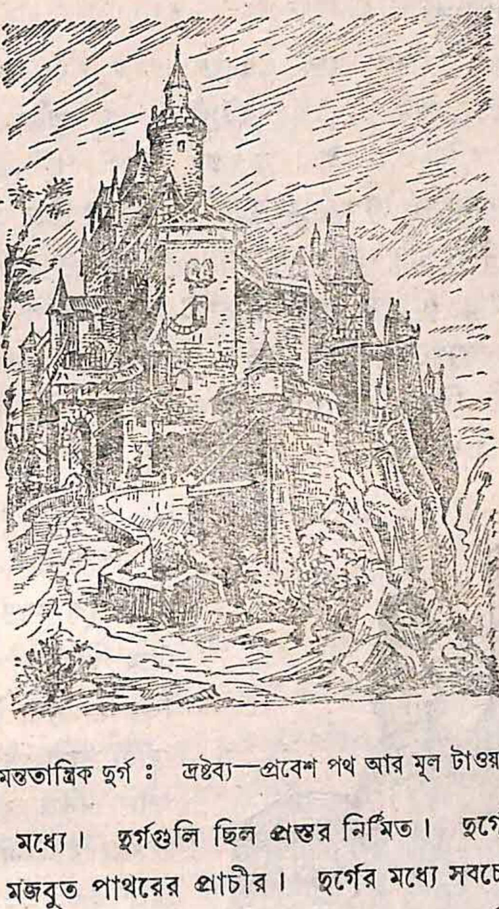
৪. সামন্ততন্ত্রের অবদান

প্রাচীনযুগে রোম ও জারমান অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থায় সামন্ত-তন্ত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগের ইউরোপে সম্পূর্ণ নতুন, একথা বলা ঠিক নয়। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে সমাজ সংগঠনে সামন্ততন্ত্রই ছিল প্রধান ভিত্তি। মধ্যযুগের সমাজ ছিল মূলত ভূমিকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর। বিশেষ অবস্থার চাপে তখনকার মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে ভূমি ও কৃষিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিল। এর পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল : প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগর ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ এই পথেই ঘটেছে। অনেকেই বাণিজ্যে অংশ নিয়েছে। পঞ্চম শতকের পর ইটালী, আফ্রিকা, স্পেন ও গলে জারমান উপজাতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তাদের অভিযানে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক পথের গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি। সপ্তম শতক থেকে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরের অঞ্চলগুলি, ঐশ্লামিক সাম্রাজ্যের অধীনে এসে গেল। ইসলামের অভিযানের ফলে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ হিসাবে ভূমধ্যসাগরের প্রধান্য কমে গেল। ইউরোপের বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ল। অষ্টম শতকের শেষে এবং নবম শতক জুড়ে ইউরোপের মানুষ নিরুপায় হয়ে কৃষিকর্মে মন দিল। বাণিজ্য নয়, কৃষিকাজই হল জীবিকার একমাত্র উপায়। জমির মালিকানাই হয়ে দাঁড়াল সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মানমর্যাদার একমাত্র পথ। এই বিশেষ অবস্থায় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতি যখন ভেঙ্গে পড়ছিল, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে রক্ষা করল।

মধ্যযুগে ইউরোপে নানাস্থানে বিশৃঙ্খলা চলছিল। নর্স, ম্যাগিয়ার, সেরাসেন, শ্লাভ প্রভৃতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপে অরাজকতা বিরাজ করছিল। সামন্তপ্রভুরা এই অবস্থায় নিজ নিজ এলাকা সুশাসনে রেখেছিল, অরাজকতার হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছিল, ইউরোপে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল। দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সাহসী অশ্বারোহী সেনা ইউরোপকে নিরাপত্তা দিয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ ঃ সামন্তপ্রভুর দুর্গ সাধারণভাবে পাহাড়ের উপর বা অন্য কোন উঁচুস্থানে নির্মিত হত। তার ঘরবাড়ি ও কেল্লা থাকত

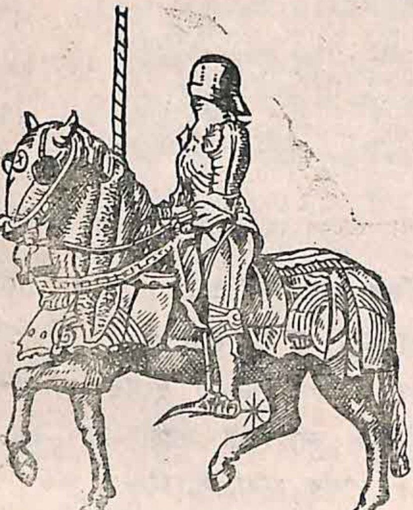


সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ ঃ দ্রষ্টব্য—প্রবেশ পথ আর মূল টাওয়ার

এই দুর্গের মধ্যে। দুর্গগুলি ছিল প্রস্তর নির্মিত। দুর্গের চারপাশে থাকত শক্ত মজবুত পাথরের প্রাচীর। দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল টাওয়ার। জলমগ্ন অঞ্চল থাকত দুর্গের চারপাশ ঘিরে। টাওয়ার-এর নির্দিষ্ট কক্ষে আহারের সংস্থান রাখা হত; প্রচুর জলও মজুত রাখা হত। দুর্গের মধ্যে স্যাঁতসেতে অন্ধকার ছোট গোপন ঘর থাকত। সেখানে অপরাধী ও বিদ্রোহী কৃষককে শিকলে বেঁধে ফেলে রাখা হত। মাঝে মাঝেই দুর্গের অশ্বারোহী সেনা অতর্কিতে দুর্গের বাইরে এসে কৃষকদের শস্যাদি লুঠ করত। বিদ্রোহী কৃষকদের আক্রোশ ও বিপক্ষ সামন্তদের আক্রমণ

থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সামন্তপ্রভু আশ্রয় নিত তার নিজস্ব দুর্গে। মধ্যযুগের কৃষকরা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দুর্গের উঁচু টাওয়ার এবং শক্ত প্রাচীরের দিকে।

ত্রুবাদুর ঃ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ফরাসীদেশের দক্ষিণে, উত্তর স্পেন ও উত্তর ইটালীতে এক শ্রেণীর গীতিকবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা ত্রুবাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপের নানা অঞ্চলে ধনীদের দুর্গে ও প্রাসাদে গিয়ে তাঁরা প্রেম ও বীরত্বের গাঁথা গান করে শোনাতেন। অনেক সময় রাজা, জমিদার, খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসী ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী নাইট তাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। আরাগণের রাজা দ্বিতীয় আলফানশো এবং ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড এই কবিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাব্য সাধনায় এই কবিদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।


অশ্বারোহী সশস্ত্র নাইট

শিভ্যালরি ঃ সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করত তীর ধনুক দিয়ে পদাতিক বাহিনীতে। কিন্তু সামন্তরা ছিল অশ্বারোহী, তারা ঢাল, তলোয়ার, বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। সামন্তদের একমাত্র পেশাই ছিল যুদ্ধ। নাইট হবার জন্য বিশদ অনুষ্ঠান পালন করতে হত। সামন্ত পুত্রদের নাইট করতে একমাত্র রাজাই পারতেন। অনুষ্ঠানে তাকে শপথ নিতে হত যে সে দুর্বলকে রক্ষা করবে এবং অনুগত ভ্যাসাল হিসাবে কাজ করবে। নাইট হবার পর নামের পাশে সে "স্যার" লিখতে পারত।

অনেক সময় তারা দ্বৈতযুদ্ধ ও নক আউট প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। নারীদের প্রতি তারা বিশেষ সৌজন্য দেখাত। নারীদের মানসম্মান রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধও করত। এই আচরণকে বলা হত শিভ্যালরি।

৫. ম্যানর প্রথা

মধ্যযুগে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। গ্রামগুলিকে তখন ম্যানর বলা হত।

গ্রামের চাষীদের পরিশ্রমে জমি চাষের প্রথা ম্যানর প্রথা নামে পরিচিত। ম্যানর প্রথা সামন্ততন্ত্রের অভিন্ন অংশ। সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রাথমিক ভিত্তি ছিল ম্যানর। ম্যানরের আদালতে সামন্তপ্রভু তাদের রাজনৈতিক ও সম্পত্তির অধিকারের দাবী নিয়ে দ্বারস্থ হত। ম্যানরের জমি চাষীরা প্রচুর পরিশ্রম দিয়ে চাষ করত। এই জমির জন্য চাষীরা প্রচুর খাজনা দিত। সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তিই ছিল চাষীদের পরিশ্রম ও চাষীদের দেওয়া খাজনা।

৬. কৃষক শ্রেণীর স্তরবিভাগ

চাষী শ্রেণীর মধ্যে নানা স্তরবিভাগ ছিল। চাষীদের অবস্থা নির্ভর করত তারা কোন স্তরে আছে তার উপর এবং জমিজমা কোন শর্তে ভোগ করছে তার উপর। সার্ফপ্রথা ছিল বংশানুক্রমিক। সার্ফের ছেলে সার্ফ হবে, এই ছিল নিয়ম। সার্ফের সঙ্গে স্বাধীন (যে ক্রীতদাস নয়) কোন মহিলার বিয়ে হলে, তাদের যে সন্তান হবে সেও সার্ফ হবে। অনেক সময় স্বাধীন চাষীরাও প্রায় সার্ফদের দলভুক্ত ছিল। কেউ যদি কিছু দায়িত্বের বিনিময়ে এবং খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতিতে জমি ভোগ করতে বাধ্য হত, তাকেও সার্ফদের মত দুর্ভোগ সহ্য করতে হত। সামন্ত শ্রেণীর নিচে বহু সংখ্যক স্বাধীন মানুষ ছিল। তাদের অনেকেই ছিল ছোটখাটো জমিদার। অনেকেই খাজনার বিনিময়ে জমি ভোগ করত। যারা খাজনা দিয়ে জমি ভোগ করত, তারা যদি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে জমি চাষ করত তাদেরকেও সার্ফদের থেকে আলাদা করে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল।

৭. সার্ফদের অবস্থা

আইনের চোখে, সার্ফদের সম্পত্তির মালিক হবারও অধিকার ছিল না। আদালতে একজন সার্ফ অপর একজন সার্ফের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত। কিন্তু তারা নিজের সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য স্বাধীন মানুষের বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারত না। একজন সার্ফ নিজেকে নিয়ে যা খুশি করতে পারত না। ইচ্ছামত সে একটি ম্যানর ছেড়ে আর একটি ম্যানরে যেতে পারত না। ইচ্ছামত সে শহরেও যেতে পারত না। চলে গেলে, তাকে জোর করে ধরে আনার অধিকার সামন্তপ্রভুর ছিল। সার্ফ যে জমি চাষ করত, সেই জমি বিক্রি হয়ে গেলেও, সার্ফ কিন্তু জমির সঙ্গেই থেকে যেত। তার জীবন খুবই দুঃখের ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা সত্য তাকে কখনই বেকার থাকতে হত না।

খুশিমত বিয়ে করার অধিকারও সার্ফদের ছিল না। বিয়ে করতে হলে সার্ফকে সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিতে হত। এই অনুমতির জন্য ফি দিতে হত। নিজের সামন্তপ্রভুর এলাকায় বিয়ে করতে চাইলে, সহজেই অনুমতি মিলত, ফিও খুব কম হত। কিন্তু নিজের সামন্তপ্রভুর এলাকার বাইরে অন্য সামন্তপ্রভুর এলাকার কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বহু ক্ষেত্রেই নিজের সামন্তপ্রভু মত দিত না। তবে এসব ক্ষেত্রে মোটা ফি ও জরিমানা দিলে অনুমতি মিলত। চার্চে শিক্ষালাভের জন্য বা শহরে ব্যবসা শেখার জন্য সার্ফরা তাদের সন্তানদের পাঠাতে পারত না। পাঠাতে হলে সামন্তপ্রভুদের অনুমতি নিতে হত এবং তাদেরকে ফি দিতে হত। প্রভুর নির্দেশমত স্কুল বা শহর থেকে সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে ম্যানর আদালতে সার্ফদের জরিমানা দিতে হত।

৮. সার্ফদের দায়দায়িত্ব

সার্ফদের নানারকম কর দিতে হত। জেলা থেকে জেলায়, ম্যানর থেকে ম্যানরে করের প্রকারভেদ ছিল। ক্যাপিটেশন নামে মাথা পিছু

দেয় কর বছরে একবার দিতে হত। টেইলী নামেও এক ধরনের কর জমির উপর ধার্য করা হত। বছরের প্রধান প্রধান উৎসব উপলক্ষে কিছু কর দিতে হত। আগে এগুলি ছিল উপহার। পরবর্তী কালে এই উপহার আবশ্যিক কর হয়ে দাঁড়ায়। হেরিয়ট নামে এক ধরনের উত্তরাধিকার কর ছিল। সার্ফের ছেলে যখন তার জমিতে উত্তরাধিকার পেত, তখন এই কর দেওয়া হত। সাধারণত ভাল আসবাবপত্র বা ভাল পশু দেওয়া হত এই কর বাবদ। চার্চকে তারা টাইদ নামে এক প্রকার কর দিত। তাছাড়া পশুচারণভূমি, বনভূমি ও পতিত জমি ব্যবহার করার জন্যও বিশেষ ধরনের ফি লাগত।

গ্রামের মিল, পাউরুটি তৈরির উনুন, মদ তৈরির দোকান, গ্রামের কুয়ো—ইত্যাদির মালিক ছিল সামন্তপ্রভুরা। এসব ব্যবহার করতে হলে চাষীদের আলাদা ফি দিতে হত। সেতু আর পথঘাটের জন্য সামন্তপ্রভুরা চাষীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত। বাজারে দোকানের জন্য সামন্তপ্রভুরা ঘরভাড়া পেতেন। বিবাদ-বিসম্বাদ মেটাবার জন্যও প্রভুরা ফি আদায় করে নিত। ফসল কাটার সময় চাষীকে প্রভুর জমিতে অতিরিক্ত কাজ করতে হত। প্রভুর জমি ও প্রভুর আদেশ তার জীবনের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকত।

সার্ফ ও দাসদের মধ্যে পার্থক্য

(১) সার্ফদের নিজের এক টুকরো জমি, পশুযুথ, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ছিল। জমিটুকুর মালিক সার্ফ নয়, সামন্তপ্রভু সার্ফের নিজের ব্যবহারের জন্য জমি তাকে দিত।

দাস নিজের ব্যবহারের জন্য জমি পেত না। তার নিজস্ব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিও ছিল না।

(২) সার্ফ সামন্তপ্রভুর জমিতে চাষ করত, আবার নিজের জমিতেও চাষ করত। নিজের জমির ফসলের কিছু অংশ সামন্ত-প্রভুকে ভাগ দিতে হত। বাকী অংশ সে নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য রেখে দিত।

দাস শুধুমাত্র মালিকের জমিতেই চাষ করত। পরিবর্তে সে মালিকের কাছ থেকে খাবার আর পোশাক পেত।

(৩) সার্ফের উপর সামন্তপ্রভুর অনেক অধিকার ছিল। তাকে বিক্রি করতে পারত, অপরাধ করলে কঠিন শাস্তি দিতে পারত, কিন্তু খুন করতে পারত না।

দাসের মালিক তার উপর যা খুশি আচরণ করতে পারত, বিক্রি করতে পারত, এমন কি খুনও করতে পারত।

৯. সামন্ততন্ত্রে শ্রেণীবিন্যাস

সামন্ততন্ত্রে আমরা স্বাধীন, বংশানুক্রমিক ভূস্বামী সামন্তপ্রভুদের জীবনের কথা জানতে পারি। ম্যানর প্রথায় আমরা দাসত্বে ক্লিষ্ট বংশানুক্রমিক কৃষককুলের জীবনের কথা জানতে পারি। একই ম্যানরে হয়ত বংশানুক্রমিক সামন্তপ্রভু আর বংশানুক্রমিক কৃষককুল দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছে, কিন্তু সমাজ জীবনে কেউ কারো মুখোমুখি হয় নি। সামন্তপ্রভুরা কৃষকদেরকে অস্পৃশ্যের মত দূরে সরিয়ে রেখেছে।

তিন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর হল যাজক সম্প্রদায়, যাদের কাজ ঈশ্বরের আরাধনা করা, প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় শ্রেণী হল সামন্তপ্রভুরা, যাদের কাজ যুদ্ধ করা। তৃতীয় শ্রেণী হল সাধারণ মানুষের দল, যাদের কাজ হল পরিশ্রম করে খাদ্য জোগাড় করা এবং নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে প্রথম দুই শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখা।

১০. সার্ফদের মুক্তি

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানর প্রথাও ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ল। কৃষিপ্রধান সমাজ থেকে ধীরে ধীরে শিল্পপ্রধান সমাজ গড়ে উঠেছিল ইউরোপের নানা দেশে। দেখা গেল যে মুক্ত চাষীদের দৈনিক ভাড়া করে খাটালে সার্ফদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায়। তাই সার্ফরা দলে দলে মুক্তি পেল। সার্ফরা নিজেরাও নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল নানাভাবে।

প্রথমত, প্রভুর অনুমতি নিয়ে অনেকেই মঠে চলে যেত। সেখানে ধর্মীয় জীবন যাপন করত।

দ্বিতীয়ত, অনেক সার্ফ ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যেত। কেউ পালিয়ে যেত শহরে। কেউ সেখানে শিল্প বা ব্যবসার কাজে ঢুকে পড়ত।

তৃতীয়ত, সার্ফরা বিদ্রোহ করত বা বিদ্রোহের ভয় দেখাত। অনেকগুলি ম্যানরের সার্ফ একত্র হয়ে প্রভুদের ভয় দেখাত। ভয় দেখিয়ে মুক্তির সনদ আদায় করত।

চতুর্থত, মধ্যযুগে নানা যুদ্ধে বা অভিযানে সার্ফরা ভাড়াটে সৈন্যের দলে ভিড়ে পড়ত।

সার্ফ অবস্থা থেকে কৃষকদের মুক্তি মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। তবু দাস প্রথা থেকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা এক ধাপ এগিয়েছে। মালিকরা খুব নির্মম ছিল বলে ক্রীতদাসরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। মালিকের জমিতে কাজ করতে তাদের এতটুকুও ভাল লাগত না। তারা চাষের কাজ মন দিয়ে করত না। তাই উৎপাদন ব্যাহত হত। সামন্তপ্রভুর জমিতে চাষ করতে ভাল না লাগলেও সার্ফের নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য যে এক টুকরো জমি ছিল, তা সে মন দিয়ে মায়া মমতা দিয়ে চাষ করত। ফলে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন বেড়ে গেল।

দাসপ্রথার চেয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ফসলের উৎপাদন বাড়ল বলে বলা হয় সামন্তপ্রথায় সমাজ এক ধাপ এগিয়েছে।

অনুশীলনী

১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন সময়কে সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলা হয়?

২। সামন্তপ্রভু কাকে বলা হত?

৩। ভ্যাসাল কাকে বলা হত?

৪। সামন্তপ্রভুরা কিভাবে অবাধ শাসন ক্ষমতা পেয়েছিল?

৫। সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যে কি ধরনের সামাজিক বন্ধন ছিল?

৬। ডিউক ও আর্ল কাদের বলা হত?

৭। নাইট কাদের বলা হত?

৮। সার্ফ কৃষককুল বলতে কাদের বোঝান হত ?

৯। নিজের জমিদারীতে প্রতিটি সামন্তপ্রভু সর্বেসর্বা ছিলেন, একথা বলা হয় কেন ?

১০। কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্তর বিভাগ বংশানুক্রমিক হয়েছিল ?

১১। সামন্তপ্রভুর অধীনে কি কি সম্পত্তি ছিল ?

১২। সার্ফ কৃষকদের কি নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল ?

১৩। কি ধরনের বেগার খেটে সার্ফদের জীবন কাটত ?

১৪। সার্ফ ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

১৫। দাসরা কি নিজের ব্যবহারের জন্য জমি পেত ? তাদের কি নিজস্ব যন্ত্র ও হাতিয়ার ছিল ?

১৬। সার্ফ গুরুতর অপরাধ করলে সামন্তপ্রভু কি তাকে খুন করতে পারত ?

১৭। সামন্ততন্ত্রের জন্য ইউরোপে কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল ?

১৮। সামন্তপ্রভুরা কি দিয়ে যুদ্ধ করত ?

১৯। নাইট হবার অনুষ্ঠানে সামন্তপুত্ররা কি ধরনের শপথ নিত ?

২০। শিভ্যালরি প্রথা বলতে কি বোঝান হত ?

২১। ম্যানর বলতে কি বোঝান হত ?

২২। ম্যানর প্রথার মানে কি ?

২৩। একজন সার্ফ কি অন্য একজন সার্ফের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারত ?

২৪। সার্ফ কাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারত না ?

২৫। সার্ফরা কি খুশীমত বিয়ে করতে পারত ?

২৬। সার্ফদের কি ধরনের কর দিতে হত ?

২৭। মাথা পিছু দেয় করকে কি বলা হত ?

২৮। জমির উপর ধার্য করকে কি বলা হত ?

২৯। হেরিয়ট কর কখন দিতে হত ?

৩০। চার্চকে যে কর দিতে হত তার নাম বল।

৩১। সার্ফদের সামন্তপ্রভুকে সাধারণত কি কি বাবদ ফি দিতে হত ?

৩২। সামন্ততন্ত্রে কয় শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। যাজক সম্প্রদায় কি করত ? সামন্তপ্রভুরা কি করত ? সাধারণ মানুষ কি করত ?

৩৩। সার্ফরা কিভাবে নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল ?

৩৪। দাসপ্রথা থেকে সামন্তপ্রথায় সমাজ এক ধাপ এগিয়েছে একথা বলা হয় কেন ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যে ছিল জমিকে কেন্দ্র করে এক—সম্পর্ক।

২। সামন্ততন্ত্র তাই এক ধরনের — যেখানে এক এক জন সামন্তপ্রভু ব্যক্তিগতভাবে — কাজ চালাত এবং দেশ — কাজ করত।

৩। একটি অনুষ্ঠানে ভ্যাসাল প্রতিজ্ঞা করত যে সে সামন্তপ্রভুর প্রতি — হয়ে থাকবে।

৪। এই আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি নয় — প্রতি।

৫। প্রত্যেক মানুষের মানমর্যাদা নির্ভর করত সে সমাজের কোন — আছে, তার উপর।

৬। সার্ফরা দাস নয়, কারণ তারা সামন্তপ্রভুদের — নয়।

৭। দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সাহসী — সেনা ইউরোপকে — দিয়েছিল।

৮। সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রাথমিক — ছিল ম্যানর।

৯। বিয়ে করতে হলে সার্ফকে — অনুমতি নিতে হত।

১০। সামন্তপ্রভুরা কৃষকদেরকে — মত দূরে সরিয়ে রেখেছে।

১১। — শ্রেণী হল — মানুষের দল, যাদের কাজ হল — করে খাদ্য জোগাড় করা এবং নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে প্রথম — শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখা।

১২। দেখা গেল যে — চাষীদের — করে খাটালে সার্ফদের চেয়ে অনেক বেশি — পাওয়া যায়।

১৩। সার্ফ অবস্থা থেকে কৃষকদের — মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি — অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মযুদ্ধ

মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত। ইউরোপের খ্রীস্টানরা মুসলমানদের কবল থেকে প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রায় দুশো বছর ধরে মাঝে মাঝেই সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। এই সামরিক অভিযানগুলিই ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ধর্মযুদ্ধ অনেকগুলি হয়েছিল। প্রথম ধর্মযুদ্ধ চলে খ্রীস্টীয় ১০৯৬ থেকে ১০৯৯ পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ ঘটে ১১৪৭ সালে। ১১৮৭ সালে মুসলমানরা পুনরায় জেরুসালেম দখল করলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ চলে ১২০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২০৪ পর্যন্ত।

প্রথম ধর্মযুদ্ধে (খ্রীঃ ১০৯৬—৯৯) যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কোন রাজা ছিলেন না। বুয়োঁলনোর গড্‌ফ্রে, তুলোর রেমন্ড্‌ প্রভৃতি সামন্তপ্রভুরা খ্রীস্টান সৈন্যদের পরিচালনা করেছিলেন। জেরুসালেম অধিকার করে তাঁরা খ্রীস্টান রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন। এই রাষ্ট্রের প্রথম শাসক ছিলেন গড্‌ফ্রে। ত্রিপলি, এডেসা ও এন্টিওক এই তিনটি রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়েছিল। এই তিনটি রাষ্ট্রও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তাছাড়া জেরুসালেম রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছিল।

১১৪৪ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীরা এডেসা পুনরায় দখল করেছিল। ফলে ১১৪৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ বিফল হয়েছিল। তারপর প্যালেস্টাইনের খ্রীস্টানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১১৮৭ সালে সালাদিনের নেতৃত্বে সারাসেন মুসলমানরা জেরুসালেম দখল করেছিল। ফলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে জারমান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের নৃপতি দ্বিতীয় ফিলিপ, এবং ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা জেরুসালেম জয় করতে পারেন নি। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের (খ্রীঃ ১২০২—৪) পরিণতি ছিল অতি

করুণ। ফ্লানডার্স, শ্যামপেন ও ভেনিস থেকে আগত খ্রীস্টান ধর্ম-যোদ্ধারা কনসটানটিনোপল অতিক্রম করতে পারে নি। ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত আরও ৪ বার ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীস্টানদের পক্ষে জেরুসালেম জয় করা আদৌ সম্ভব হয় নি।

ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা

জেরুসালেম উদ্ধারের সঙ্কল্প: জেরুসালেম ছিল খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমি সম্পর্কে খ্রীস্টানদের মনে ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। জেরুসালেমে তীর্থযাত্রাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করত। ১০৭৬ সালে মুসলমান সেলজুক তুর্কীরা জেরুসালেম দখল করেছিল। যে সমস্ত খ্রীস্টান তীর্থযাত্রী জেরুসালেমে যেত, তুর্কীরা তাদের নিদারুণ উৎপীড়ন করত। তীর্থযাত্রীদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনে ইউরোপের খ্রীস্টানরা খুবই কাতর হয়েছিল। তাই তারা মুসলমানদের হাত থেকে জেরুসালেম উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

ইটালীর নগরগুলি এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ তাদের আসল লক্ষ্য ছিল। অনেক রাজা ও সামন্ত এই ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজাদের মনে ছিল প্রাচ্য দেশে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা। সামন্তরা নতুন দেশে ভূসম্পত্তি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। তাদের অসংখ্য সার্ফ ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তারা চেয়েছিল দুঃখদুর্দশা ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে। অনেক অপরাধী ঋণ ও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে ধর্মযুদ্ধে মেতে উঠেছিল।

ইউরোপের অরাজক অবস্থা দূর করার জন্য চার্চের নেতৃত্বে একটি শান্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের নাম ঈশ্বরের নামে শান্তি ও যুদ্ধ বিরতি। এই আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই কমে গেল। ধন সম্পদের নিরাপত্তাও বেড়ে গেল। শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব চার্চই নিয়েছিল। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে সামন্তপ্রভুরা ধর্মযুদ্ধে যেতে পেরেছিল।

চার্চের মধ্যেই খুব পরিবর্তন ঘটেছিল। বর্বর উপজাতিরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের সংস্পর্শে চার্চও রণপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে খ্রীস্টান জগতের রণপ্রিয় মনোভাবের প্রকাশ হল শিভ্যালরি। শিভ্যালরির পেছনেও চার্চের অনুমোদন ছিল। মধ্যযুগ ধরে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ ঘটেছে। ইসলাম ধর্মের রণোন্মাদনা চার্চের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। এই দীর্ঘকালের ধর্মযুদ্ধে চার্চ উৎসাহ, প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছে।

২. সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ধর্মযুদ্ধের ফলে সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা কমে গেল। যুদ্ধে যে সব সামন্তপ্রভুরা গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আর ফিরলেন না। তাদের জমিজমা রাজার হস্তগত হল। অনেক সামন্তের ধনসম্পদ ধর্মযুদ্ধের খরচ জোগাতে নিঃশেষ হয়ে গেল। সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা বেড়ে গেল।

অনেক সার্ফ মুক্তি পেল। শিল্প ও শহর গড়ে উঠলে ম্যানরে দাসত্বের জীবন ছেড়ে বহু সার্ফ শহরে চলে এল। তারা শিল্পে নিযুক্ত মজুর ও শহরের নাগরিক হল। সেখানে তারা স্বাধীন জীবনের আস্বাদ পেল।

নারীদেরও সম্মান খুব বেড়ে গেল। স্বামীরা ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতে যখন দেশের বাইরে ছিল, স্ত্রীরা তাদের জমিজমা দেখাশুনা করত, সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করত! এইভাবে সমাজের চোখে নারীরা খুব উঁচু আসন লাভ করল।

প্রাচ্যের মুসলমান ও গ্রীকদের সংস্পর্শে ইউরোপের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। লম্বা পোশাক ও লম্বা দাড়ি রাখার অভ্যাস শুরু হল! চিনির ব্যবহারও খুব বেড়ে গেল। প্রাচ্যের দামাস্ক, মসলিন, সাটিন, ভেলভেট, কম্বল, রঙ, সুগন্ধি আর মণিমুক্তা ইউরোপের সামন্ত প্রভুদের ঘরে স্থান পেল। চিত্রাঙ্কিত কাঁচের আয়নারও আমদানি হল প্রচুর।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে জাতীয় চেতনা প্রকাশ পেল। অনেক দিন ধরে এক সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে শিখল, জানতে শিখল, সুখে, দুঃখে ভালবাসতে শিখল। এই একত্রে থাকার অনুভূতি থেকে জাতীয় চেতনা গড়ে উঠল।

৩. নতুন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র

ইটালীর বণিকরা ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য তরী ভাসিয়ে দিল। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, কলোন, মার্সাই, বার্সেলোনা অঞ্চলের বণিকরা প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই ব্যবসা করছিল। ধর্মযুদ্ধের ফলে বসফোরাস ও কৃষ্ণসাগরের পথে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব বেড়ে গেল। প্রাচ্য থেকে রেশম, চিনি ও মশলা প্রচুর পরিমাণে আসতে লাগল। নানা জাতের গাছগাছড়া ও ফসল ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্য থেকে নিয়ে এল।

প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য অনেক সৈন্য, অনেক রসদ, অনেক খাদ্য পাঠাতে হচ্ছিল। এই কারণে খুব বড় বড় জাহাজ তৈরির কাজে সবাই মন দিল। ইটালীর কাছ থেকে আর মুসলমানদের কাছ থেকে ইংলণ্ড বড় জাহাজ তৈরির বিদ্যা আয়ত্ত করল।

প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপের যুদ্ধ চলেছে আবার ব্যবসাও চলেছে। ব্যবসা ভালভাবে চালাতে গেলে মুদ্রার প্রয়োজন। স্বর্ণ মুদ্রা ইটালীর নানা অঞ্চলে চালু হয়ে গেল। যুদ্ধের জন্যই হোক আর ব্যবসার জন্যই হোক, অনেক টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করাও সম্ভব নয়। তাই ব্যাঙ্কের প্রয়োজন দেখা দিল। মুসলমানদের কাছ থেকে ইটালীর বণিক পরিবারের লোকজন ব্যাঙ্কের রীতিনীতি শিখেছিল।

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষিকাজ ছিল আর্থিক জীবনের মূল কথা। ধর্মযুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে। কারিগর ও বণিকদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। শহরে তৈরি কুটির শিল্পের জিনিস গ্রামের লোকেরা কিনতে শুরু করল। শহরের মানুষরা কিনতে

লাগল গ্রামে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য। ছোট ছোট বাজারে কেনা বেচা শুরু হল। কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ আলাদা হয়ে গেল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ দেখা দিল।

এগারো শতক পর্যন্ত চাষীদের গ্রাম্য জীবন এবং সামন্তপ্রভুদের প্রাসাদ ও দুর্গই ছিল মধ্যযুগের প্রধান চিত্র। ধর্মযুদ্ধের ফলে বণিক ও কারিগরদের সংখ্যা বেড়ে গেল। শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই শহরগুলি হল ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, কলোন, মার্সাই ইত্যাদি।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রী: ১০৯৬-৯৯	প্রথম ধর্মযুদ্ধ
খ্রী: ১১৪৭	দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ
খ্রী: ১১৮৭	তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ
খ্রী: ১২০২-০৪	চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধ কথাটির অর্থ কি?
২। ইউরোপের খ্রীস্টানরা কেন জেরুসালেম উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন?
৩। ইটালীর নগরগুলি ইউরোপের রাজা ও সামন্ত শ্রেণী, সার্ফ, অপরাধী এসব শ্রেণী কি উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল?
৪। ধর্মযুদ্ধের ফলে সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা কমে গেল কেন?
৫। ধর্মযুদ্ধের ফলে সার্ফদের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছিল?
৬। সমাজে নারীদের সম্মান বেড়ে গেল কেন?
৭। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সামন্ত শ্রেণী কি কি নতুন জিনিস ব্যবহার করতে শিখল?
৮। ব্যবসা সূত্রে কি কি জিনিস প্রাচ্য থেকে ইউরোপে আসত?
৯। বড় বড় জাহাজ তৈরির প্রয়োজন হয়েছিল কেন?
১০। মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয়েছিল কেন?
১১। মধ্যযুগের ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত শহরের নাম কর।

১২। মধ্যযুগে কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ কিভাবে আলাদা হয়ে গেল ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম — নামে খ্যাত।

২। প্রাচ্যের মুসলমান ও গ্রীকদের — ইউরোপের মানুষের দৈনন্দিন — অনেক — দেখা দিল।

৩। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে — চেতনা প্রকাশ পেল।

৪। ধর্মযুদ্ধের ফলে বসফোরাস ও কৃষ্ণসাগরের পথে — খুব বেড়ে গেল।

৫। কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ — হয়ে গেল।

৬। উৎপাদনের ক্ষেত্রে — দেখা দিল।

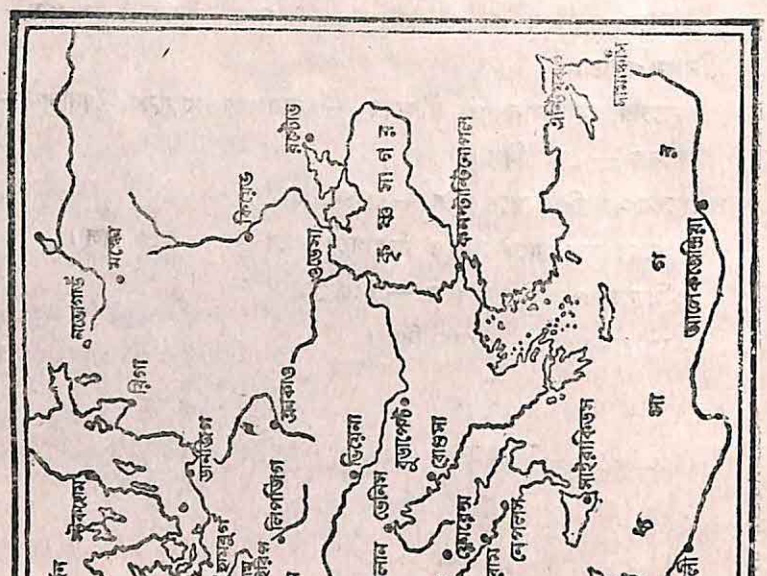
নবম অধ্যায়

গিল্ড বা সংঘ

১. শহরে গিল্ডের কার্যকলাপ

মধ্যযুগে স্থানীয় কেনাবেচা ছিল, আবার দেশ বিদেশের মধ্যে বাণিজ্যও ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ধর্মযুদ্ধের ফলে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মযুদ্ধের টাকা, রসদ, জাহাজ সরবরাহ করত বণিকরা। ইটালীর বণিকরা এই সুযোগে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। ইউরোপের ধনীদের জন্য রেশমী কাপড়, মণিমুক্তা, রান্নার মশলা প্রাচ্য দেশ থেকে আমদানি করা হত। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে অনেক শহরের পত্তন হয় সমুদ্রতীরে, না হয় বাণিজ্য পথে। জেনোয়া ও ভেনিস ছিল সমুদ্রতীরে। ফ্লোরেন্স, মিলান ও

পিসার অবস্থান ছিল বাণিজ্য পথের উপর। এ সব শহরে বণিকদের প্রতিপত্তিও খুব বেড়ে গিয়েছিল।



প্রাচীন রোমের মানুষ নানাভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। মধ্যযুগের মানুষের মধ্যেও সংঘবদ্ধ হবার রীতি বজায় ছিল। এগারো শতকে ইউরোপের প্রধান প্রধান অঞ্চলে বণিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। এই সংঘকে বলা হত বণিকের গিল্ড। গিল্ডগুলি অনেক নিয়মকানুন মেনে চলত। কোন কোন জিনিসের উপর এক একটি গিল্ড একচেটিয়া

কারবারের দাবী জানাত। নির্দিষ্ট গিল্ডের জন্য কাজ করতে কারিগরদের বাধ্য করা হত। কখনও বা কারিগরদের বলা হত নির্দিষ্ট গিল্ডের মাধ্যমেই তাদেরকে জিনিস বিক্রি করতে হবে। কখনও বলা হত সেই গিল্ডের বিনা অনুমতিতে অন্য কোথাও কারিগররা জিনিস বেচতে পারবে না।

বণিকদের গিল্ডের দায়িত্ব : বড় বড় বণিকদের গিল্ডগুলির অনেক ক্ষমতা ছিল। সেগুলি বিস্তর কাজও করত। কাঁচামাল কেনা, খাদ্যদ্রব্য জোগান, রাস্তাঘাট তৈরি করা এবং পরিষ্কার রাখা, বন্দর দেখাশোনা করা, বড় বড় রাজপথ পাহারা দেওয়া, বাজারের তত্ত্বাবধান করা, কারিগরদের ও শ্রমিকদের বেতন, কাজের সময়, কাজের শর্ত ঠিক করে দেওয়া, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য স্থির করে দেওয়া—এমনি নানা কাজের দায়িত্ব তাদের ছিল।

বছরের মধ্যে কমপক্ষে চার পাঁচবার গিল্ড জিনিসের ন্যায্য দাম বেঁধে দিত। তাদের অঞ্চলে যে সব জিনিসের কেনাবেচা হত, সেগুলির ওজন নেওয়া, গোনা পরীক্ষা করে দেখা—এ সবও গিল্ডকেই করতে হত। খারাপ জিনিস বাজারে যাতে না আসতে পারে, সেদিকেও তারা চোখ রাখত। তারা রাজনীতিতেও অংশ নিত। সামন্তপ্রভু, বিশপ এবং রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত।

গিল্ডের নিজস্ব আদালত ছিল এবং ঝগড়াঝাটি হলে সেই আদালতেই প্রথমে তা নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হত। সভ্যদের দুঃখ দুর্দশায় ও আপদে বিপদে গিল্ড দেখাশোনা করত। শহরের চার্চ মেরামত করা বা সাজানো, কখনো শহরের মানুষদের আনন্দ দেবার জন্য নাটকের আয়োজন করা এসব কাজও গিল্ড করত।

কারিগরদের গিল্ড ও সেগুলির দায়িত্ব : কারিগরদেরও নিজস্ব গিল্ড ছিল। ১০৯৯ সালে লণ্ডন, লিনকন ও অক্সফোর্ডে চামড়াশিল্প, বস্ত্রশিল্পের কারিগররা এবং স্বর্ণকাররা নিজস্ব গিল্ড গড়ে তোলে। এই ধরনের কারিগরদের গিল্ড ভেনিসে ছিল ৫৮, জেনোয়াতে ছিল ৩৩, ফ্লোরেন্সে ছিল ২১, কোলনে ২৬, প্যারিসে ১০০। সাধারণভাবে নিয়ম

ছিল যে গিল্ডের সভ্য না হলে কেউ কারিগরি কাজে নিযুক্ত থাকতে পারবে না। গিল্ডের প্রধান কে হবে তা প্রতি বছর ভোটাভুটির মাধ্যমে স্থির করা হত। গিল্ডের নিয়মকানুন স্থির করে দিত সভ্যদের কাজের শর্ত, বেতনের সীমা, তাদের উৎপন্ন জিনিসের দাম। কারিগরি গিল্ডগুলিও সভ্যদের আপদে বিপদে সাহায্য করত, সভ্যদের মেয়ের বিয়ের যৌতুক জোগাত, মৃত আত্মীয়ের কবর দেবার খরচ দিত, মৃত সভ্যের বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ করত। তাছাড়া বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও চার্চের কাজেও অর্থ সাহায্য করত।

২. শহরের জীবনযাত্রা

মধ্যযুগের শহরে জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সাধারণত পাঁচ ছয় হাজারের বেশি লোকজন শহরে বাস করত না। লণ্ডন ও প্যারিস শহরের জনসংখ্যা দশ হাজারের মত ছিল।

শহরের মানুষ সাধারণত ব্যবসা আর কারিগরি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কৃষিকাজ তারা একেবারে পরিত্যাগ করেনি। শহরের প্রাচীরের চারপাশ দিয়ে জমি ছিল, সেখানে তারা শাকসব্জী আর ফলের চাষ করত। তাছাড়া পশুচারণক্ষেত্র ছিল।

প্রাচীর ঘেরা শহরে জায়গার অভাব খুবই ছিল। তাই দোতলা বা তিনতলা বাড়ি তৈরি হত। রাস্তাঘাট ছিল সরু, সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার। বাড়ির নোংরা আবর্জনা জানলা দিয়ে তারা রাস্তায় ফেলে দিত। বৃষ্টি হলে জায়গায় জায়গায় খুব জল জমত।

শহরের একমাত্র খোলামেলা জায়গা ছিল বাজার। শহরের প্রধান চার্চ যাকে ক্যাথিড্রেল বলা হয়, বাজারের কাছেই থাকত। ক্যাথিড্রেল ছিল শহরের সুন্দর বাড়ি। এ ছাড়া একটি টাউন হলও ছিল। সেখানে শহরের শাসন পরিষদ—মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলের সভা বসত। সেই টাউন হলে একটি উঁচু টাওয়ার থাকত। টাওয়ারের মধ্যে থাকত একটি দেওয়াল ঘড়ি। বাজারের দিকে মুখ করে ঘড়িটাকে টাঙানো হত।

শহরের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি ছিল কাঠের তৈরী। আগুন লাগলে সমস্ত শহর পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। বড়লোকদের বাড়ি তৈরি হত পাথর দিয়ে। বড়লোকদের বউরা দামী পোশাক ও গয়নাগাটি ব্যবহার করত।

গরীব লোকরা বণিক ও কারিগরদের কাজ করত। তাদের অন্যতম কাজ ছিল পশম ধোয়া এবং বাছাই করা এবং মাথায় করে বড় বড় বোঝা বহন করা। শহরে মাঝে মাঝেই সংক্রামক রোগের মড়ক লাগত। মধ্যযুগে যুদ্ধের অভিশাপ ত ছিলই। অনেক গরীব লোক পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে পড়ত। তারাই শহরে হয় চুরি করে, না হয় ভিক্ষুক হয়ে জীবন কাটাত। দুর্ভিক্ষের সময়ে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভীড় জমাত। অদক্ষ শ্রমিক ও ভিক্ষুকরাই ছিল শহরের গরীব শ্রেণী।

৩. শহরের মানুষের স্বাধীনতা

শহরের নাগরিকরা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ছিল। সার্ফ জীবনের যাবতীয় দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির জন্যই তারা শহরে এসেছিল। তারা চলাফেরার স্বাধীনতা চায়, বাণিজ্যের স্বাধীনতা চায়, সামন্তপ্রভুর বিনা হস্তক্ষেপে বিবাহের স্বাধীনতা চায়। রাজার দেওয়া সনদে এ সব স্বাধীনতা মিলেছিল। সনদে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে যদি কোন সার্ফ শহরে এসে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরুপদ্রবে ৩৬৬ দিন বাস করে, তাহলে তাকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে। নিজের জমি জমা ও সম্পত্তি হস্তান্তর করার (অর্থাৎ বিক্রি করার, দান করার, লিজ দেবার) অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল শহরবাসীর। তাদের নানা ধরনের সামন্ত প্রথার কর দিতে হত না। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা তারা দিত অর্থের পরিমাণে। অপরাধীদের বিচার হত স্থানীয় আদালতে, সামন্তপ্রভুদের আদালতে নয়। এ সব ছিল সাধারণ শহরের মানুষের স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা। বড় শহরের মানুষের স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা ছিল অনেক বেশি।

যে সব জায়গায় শিল্প বাণিজ্য খুব প্রসার লাভ করেছিল সে সব জায়গায় শহরের মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল খুব বেশি। যেমন, উত্তর ও উত্তর-মধ্য ইটালী, দক্ষিণ ও উত্তর ফ্রান্স, রাইনল্যাণ্ড ও ফ্ল্যানডার্স। যে সব স্থানে সরকারের শাসন ব্যবস্থা খুব দুর্বল ছিল, সে সব দেশের শহরের মানুষেরও স্বাধীনতা ও অধিকার খুব বেশি ছিল। যেমন, জারমানী ও ইটালী। যে সব জায়গায় শাসন শক্তিশালী ছিল, সে সব দেশের শহর বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি। যেমন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শহরগুলি।

৪. শহরের অবদান

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রীতদাস আর সার্ফদের পরিশ্রমের কোন সম্মান ও মর্যাদা ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শহরে বণিক গিল্ড ও কারিগর গিল্ডের সভ্যদেরকে নিজের নিজের গিল্ডের জন্য পরিশ্রম করতে হত, শহরের শাসনের কাজে অংশ নিতে হত। তাদের পরিশ্রমের মর্যাদা বাড়ল। শহরে শিল্পের বিকাশ শ্রমের মর্যাদার উপর নির্ভর করেই ঘটেছে। মধ্যযুগের কাছ থেকে শ্রমের মর্যাদা বোধ আধুনিক যুগ গ্রহণ করেছে।

এগারো শতকে ইউরোপের সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল: সামন্তপ্রভু শ্রেণী, তাঁদের কাজ ছিল যুদ্ধ করা; যাজক শ্রেণী, তাঁরা ধর্ম-সংগঠনে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষক শ্রেণী, তাদের কাজ ছিল জমি চাষ করা। দ্বাদশ শতকে ছোট বড় অনেক শহর গড়ে উঠল। একে বলা হয় অর্থনৈতিক বিপ্লব। দ্বাদশ শতকের অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে বার্গেশ বা বুর্জোয়া শ্রেণী জন্ম নিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর অবির্ভাব সমাজে সম্পূর্ণ নতুন। বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ছিল বণিকরা, কারিগর মালিকরা, ব্যাঙ্কের অংশীদাররা। সামন্তশ্রেণীর সম্পদ আসত জমির মালিকানা থেকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পদ এসেছিল শিল্প থেকে, বাণিজ্য থেকে। মধ্যযুগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বলা হত।

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধের ফলে শহরের আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল ?
২। বণিকদের গিল্ড বলতে কি বোঝ ?
৩। বণিকদের গিল্ডগুলি সাধারণত কি কাজ করত ?
৪। কারিগরদের গিল্ডগুলি সাধারণত কি কাজ করত ?
৫। মধ্যযুগের ইউরোপে শহরে সাধারণত কত লোক বসবাস করত ?
৬। শহরের মানুষ কি কাজ করত ? তারা কি কৃষিকাজ একেবারেই করত না ?
৭। মধ্যযুগের শহরের বর্ণনা দাও।
৮। শহরের টাউন হলে কাদের সভা বসত ?
৯। শহরের বাড়িঘর কি দিয়ে তৈরি হত ?
১০। শহরে গরীব মানুষ কাদের বলা হত ? তাদের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও।
১১। রাজকীয় সনদের বলে শহরের মানুষরা কি কি স্বাধীনতা পেয়েছিল ?
১২। কোন কোন জায়গায় শহরের মানুষের স্বাধীনতা সুযোগ সুবিধা ও অধিকার খুব বেশি ছিল ?
১৩। কোন কোন জায়গায় শহরের মানুষ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি ?
১৪। শহরে শ্রমের মর্যাদা কেন বেড়েছিল ?
১৫। কাদেরকে বলা হত বুর্জোয়া শ্রেণী ?
১৬। বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনসম্পদ কিভাবে আসত ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। মধ্যযুগের শেষের দিকে — ফলে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে।
২। ইটালীর বণিকরা এই সুযোগে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে — শুরু করে।
৩। কখনও বলা হত সেই গিল্ডের বিনা — অন্য কোথাও কারিগররা জিনিস বেচতে পারবে না।
৪। বছরের মধ্যে কমপক্ষে চার পাঁচবার গিল্ড জিনিসের — দাম বেঁধে দিত।
৫। — ছিল শহরের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি।
৬। — দিকে মুখ করে ঘড়িটাকে টাঙানো হত।

৭। — সময়ে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ — এসে ভীড় জমাত।

৮। মধ্যযুগের কাছ থেকে — মর্যাদাবোধ আধুনিক যুগ গ্রহণ করেছে।

৯। বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব সমাজে সম্পূর্ণ —।

১০। মধ্যযুগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে — বলা হত।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য ও চীন

১. থাং যুগে চীনের সভ্যতা

ঐক্যবদ্ধ চীন ঃ চীনে থাং রাজবংশ দীর্ঘ তিনশ বছর (খ্রীঃ ৬১৮—৯০৭) রাজত্ব করেছিল। নানা কারণে এই রাজবংশের রাজত্বকাল স্মরণীয়। থাং আমলে তুর্কী ও তুংগুস উপজাতিদের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। থাং সম্রাট থাই সুং পূর্ব তুর্কীদের পদানত করেন। তিনি পশ্চিমী তুর্কীদের হাত থেকে তারিম অঞ্চল ছিনিয়ে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বিজয় অভিযানে উইগুর উপজাতি ছিল থাং সম্রাটের সহযোগী। মধ্য এশিয়াতে চীনের সামরিক শক্তির তারাই ছিল মূল ভিত্তি। পামীরের ওপারে অকসাস উপত্যকার রাজ্যে, এমনকি সিন্ধু নদ পর্যন্ত চীনের শক্তি প্রসারিত হয়েছিল। বর্তমানে ভিয়েৎনাম যে অঞ্চলকে বলা হয় তখন তা আন্নাম নামে পরিচিত। আন্নাম ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তিব্বতও চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রায় ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত চীনের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে। ৬৪৯ থেকে ৬৮৩ সালের মধ্যে কোরিয়াও চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ থাং শাসকরা হানযুগের এবং সুই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারা নিয়ম করেছিলেন যে সরকারী রাজকর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাজকর্মচারীদের বাছাই করে নেওয়া হত। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। রাজপরিবারের এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ছেলেরা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। বড় চাকরি পেতে হলে চিন-শি পরীক্ষা দিতে হত। থাং যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ধীমান আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী তেরশ বছরে চীনের নেতৃবৃন্দ এসেছে এই ধীমান আমলাতন্ত্র শ্রেণী থেকে। থাং যুগের সংগঠিত আমলাতন্ত্র চীন সভ্যতার একটি প্রধান কৃতিত্ব। থাং যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল কনফুসীয় আদর্শে গঠিত। কনফুসীয় আদর্শে সুনীতিবোধ, পরিবারের কর্তা ও দেশের শাসকের প্রতি আনুগত্য এবং যথারীতি নিয়ম ও অনুষ্ঠান মেনে চলাকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছিল। কনফুসীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমলাবাহিনী সুনীতিবোধ শিখেছে, আনুগত্যবোধ শিখেছে এবং অনুষ্ঠান রীতিনীতি মেনে চলেছে। সমস্ত দেশে একই শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। দেশের রাজকর্মচারীরা নির্বাচিত হত একই পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এই কারণে চীনে শিক্ষার জগতে ঐক্য ব্যবস্থাকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও সমর্থন করেছিল। পরীক্ষা পাশ করলেই তাদের পক্ষেও উচ্চপদের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল।

জ্ঞানচর্চা ঃ থাং যুগের প্রথম দিকে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের চর্চা অনেকটা এগিয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উৎসাহে ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে চীনা পণ্ডিতরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বারুদের আবিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে বারুদের ব্যবহার তখনো চালু হয় নি। উৎসবে অনুষ্ঠানে আতসবাজীতে বারুদ ব্যবহার করা হত।

সাহিত্য ঃ বৌদ্ধ গল্প কাহিনী ছিল সে সময় চীনা সাহিত্যের

বিষয়বস্তু। নানা ধরনের গীতি কবিতার চলন ছিল। 'শি' নামে এক ধরনের গীতি কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে প্রচুর হাহুতাশ করা হয়েছে এ সব কবিতায়। কবিতা লেখা হত সমাজের সমস্যা নিয়ে নয়। ব্যক্তির সুখদুঃখই ছিল কবিতার বিষয়বস্তু।

চা : চা পান থাং যুগের চীনে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাই চা-উৎপাদনও বেড়ে গিয়েছিল। চীনে চা পানের অভ্যাস এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। তখন চা পান করা হত ওষুধ হিসাবে কোন কোন রোগ নিরাময়ের জন্য। কখনও বা চা পান করা হত ধ্যানে উদ্দীপনা পাবার জন্য। কিন্তু থাং যুগের শেষে সাধারণ লোকের মধ্যে চা পানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ল। চীন থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায় চা রপ্তানি হতে লাগল।

ছাপাখানা : সভ্যতা বিকাশের দুটি বড় অঙ্গ—কাগজ ও ছাপাখানা চীনের দান। প্রাচীন কাল থেকেই চীনে সরকারী কাজের জন্য 'শীল' ব্যবহার করা হত। এই শীল প্রথমে তৈরী হত ধাতু দিয়ে, পরে তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। সপ্তম শতকের শীল তৈরীর বিদ্যা থেকে পুরোপাতা ছবি ও লেখা ছাপার জন্য কাঠের ব্লক তৈরির কাজ তারা শিখে নিল। ৮৬৮ সালে চীনে এইভাবে বৌদ্ধ সূত্র ছাপা হল। দশ শতকের মাঝামাঝি সমস্ত বৌদ্ধ ত্রিপিটক ও চীনের প্রাচীন সাহিত্য ছাপা হয়ে গেল।

শিল্প কলা : সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে বৌদ্ধ প্রভাবে পরিবর্তন দেখা দিল। মধ্য এশিয়া থেকে নতুন ধরনের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র আমদানি হল। ভাস্কর্যেও বৌদ্ধ প্রভাব দেখা গেল। অনেক বুদ্ধ মূর্তি তৈরি হল। থাং যুগের শিল্পীদের তৈরি এই মুর্তিগুলি ছিল প্রায় জীবন্ত। অজানা শিল্পীদের হাতে তৈরি নৃত্যরতা নারী, ছুটন্ত ঘোড়া, উট এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে যুগের আয়নায় লতাপাতা ফুল ও প্রাণী এঁকে অলঙ্করণ করা হত। থাং যুগের চিত্রকলার বহু নিদর্শন লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে একথা সত্য যে চিত্রকলাতেও বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট।

২. থাং যুগে অর্থনৈতিক অগ্রগতি

থাং যুগে চীনের সীমান্ত যে শুধুমাত্র প্রসারিত হল, তা নয়। এই সুদীর্ঘ সীমান্ত ছিল শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত। জলসেচের নিপুণ ব্যবস্থা ছিল। তাই প্রচুর ফসল ফলান সম্ভব হত। কয়েকটি দীর্ঘ খাল খনন করে সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছিল। বিরাট খাল খনন করে ইয়াংসি ও পীত নদীর উপত্যকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটান হয়েছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য ঃ চীনের সনাতন সমাজে বাণিজ্যের ও বণিকদের কোন সমাদর ছিল না। অষ্টম শতকেও এ ধারণা পালটায় নি। কিন্তু তা সত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর বেড়েছিল। চীনের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে পথে ঘাটে অসংখ্য দোকান স্থাপিত হল। গ্রামাঞ্চলে বিনিময় প্রথার মধ্য দিয়ে ব্যবসা চলত। কর ধার্য করে ও অন্যান্য উপায়ে সরকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। থাং যুগে বণিকদের নিজস্ব সংগঠন ছিল। এই সংগঠনকে বলা হত 'হং'।

থাং যুগে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। স্থল পথে বাণিজ্যেরও বিস্তৃতি ঘটে ছিল। মধ্য এশিয়া হয়ে রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে চীনের রেশমের ব্যবসা চলত। থাং যুগেও এ ব্যবসা চালু ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যও বেড়েছিল। চীনের বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বণিকরা এসে ভীড় করত। জাপান থেকে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত সমস্ত দেশেই চীনের জিনিসপত্রের চাহিদা খুবই ছিল। তখনও ক্যানটন ছিল ব্যস্ত বন্দর।

আমদানি রপ্তানি ঃ চীনের গ্রন্থ ও চিত্রকলা এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য কোরিয়া ও জাপানে রপ্তানি করা হত। চীনামাটির জিনিস রপ্তানি করা হত কোরিয়া, জাপান, ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে। চীন আমদানি করত সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র। স্তেপভূমি থেকে আমদানি করত ঘোড়া ও চামড়া। দামী কাঠ, হাতির দাঁত, মণিমুক্তা এবং মশলা চীনে আমদানি করা হত।

কৃষি ব্যবস্থা ঃ থাং যুগে লোক সংখ্যা বেড়েছে। এতদিন কর ধার্য

করা হচ্ছিল মাথা পিছু হিসাবে। এখন থেকে তা ধার্য করা হল জমির উপর। করের বোঝা ছোট চাষীকে বেশী করে বইতে হল। লোক সংখ্যা বাড়ার ফলে জমির উপর চাপ পড়ল। ক্ষেত খামার টুকরো হয়ে গেল। ছোট ছোট চাষীরা দেউলিয়া হয়ে পড়ল।

৩. চীনে বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের দান : পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম বিকশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক প্রয়োজন মিটিয়েছে। দেশের দুঃসময়ে বৌদ্ধসংঘ, ইউরোপের খ্রীস্টান ধর্মসংঘগুলির মত, শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। থাং যুগে বৌদ্ধ ধর্মসংঘ নানা ধরনের কাজ করত। সমাজে যারা উৎপীড়িত নিপীড়িত হত এবং সমাজ থেকে যারা বিতাড়িত হত, তাদের অনেকেই বৌদ্ধ সংঘে আশ্রয় নিত। সংঘ ছিল পথচারীর সরাইখানা। এখানে রোগীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ছিল। সংঘগুলি ব্যাঙ্কের কাজও করত। অনেকেই এখানে টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস জমা রাখত। অনেকে সংঘ থেকে টাকা পয়সা ধারও নিত।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ : চীনের শাসকরা ভেবেছিল যে সংঘের দুর্নীতি দূর করতে হলে সংঘের সংখ্যা কমান উচিত, সংঘের ধন-সম্পত্তির পরিমাণও কমান উচিত। রাষ্ট্র বৌদ্ধধর্মকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। থাং শাসকরা ভিক্ষুকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ৭২৯ সালে প্রতি তিন বছর অন্তর ভিক্ষুদের সংখ্যার হিসাব পরীক্ষা শুরু করা হয়।

বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন : থাং যুগে বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন করা হয়েছে। বিদেশী ধর্ম হিসাবে অনেকেই বৌদ্ধধর্মকে ঘৃণা করেছে। কিন্তু নির্যাতনের আসল কারণ অর্থনৈতিক। সংঘের বিপুল জমিজমা ও সম্পত্তির উপর অনেকেরই লোভ ছিল। সোনা ও ব্রোঞ্জের তৈরী বুদ্ধ মূর্তি থাং সম্রাটকে প্রলোভিত করেছিল। সোনার প্রয়োজন ছিল রাজকোষের জন্য আর তামার প্রয়োজন ছিল মুদ্রার জন্য। এই কারণে

৮৪১ থেকে ৮৫৫ সালের মধ্যে থাং সম্রাট নির্মমভাবে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেন। সরকারী হিসাব মত ৪৬০০ বৌদ্ধ সংঘ ও ৪০,০০০ বৌদ্ধ বেদী নির্মূল করা হয়েছিল। ২৬০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীর নাম সংঘের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল। এর পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের একমাত্র 'ছান শাখা' ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় চীন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।

চীন সভ্যতার বিস্তার ঃ সপ্তম শতকে তিব্বতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ৭৪০ সালে উন্নানে নান-চাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বত ও নান চাও থাং যুগের শাসন কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। নান-চাও এর অধিবাসীদের বলা হত থাই। তারা দক্ষিণে এসে শ্যাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মাধ্যমে শ্যামদেশেও চীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ৬৬৮ সালে কোরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। কোরিয়াও চাং চীনের আদর্শ গ্রহণ করে। ৭১৩ থেকে ৯২৬ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব কোরিয়াতে পো-হাই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। থাং শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু আদর্শ পো-হাই রাজ্য গ্রহণ করেছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতকে জাপানীরা তাদের দ্বীপপুঞ্জে আর একটি ছোটখাটো থাং রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল।

৪. হিউয়ান-সাং-এর ভারত ভ্রমণ

ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য ঃ থাং রাজবংশের আমলে অনেক চীনা ভিক্ষু ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়ান-সাং বিশেষ পরিচিত। ২০ বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রেও অনেক জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষে আসা মনস্থ করেন। কিন্তু চীন সম্রাটের অনুমতি পেলেন না। তা সত্ত্বেও ৬২৯ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। সে যুগে পথে বহু

বাধা বিঘ্ন ছিল। মরুভূমি পাহাড় ও অজানা দেশে ১৫,০০০ মাইল যাত্রাপথে তিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। প্রায় পনের বছর ধরে (খ্রীঃ ৬২৯-৬৪৪) তিনি দেশের বাইরে ভ্রমণ করেছেন।


হিউয়েন-সাং

মধ্য এশিয়ার কাও-ছাং (তুর্ফান) অগ্নিদেশ (কারাশর) প্রভৃতি দেশ দর্শন করে তিনি থিয়েন্‌-শান্‌ পর্বত অতিক্রম করলেন। তারপর তাস্কেন্দ, সমরকন্দ, ফারগানা প্রভৃতি দেশ হয়ে তিনি বাল্‌ক (বাহলীক) দেশে আসেন। বাল্‌ক ছিল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রভূমি। এখানে কিছুদিন থেকে তিনি বামিয়েনে পৌঁছান। বামিয়েন থেকে তিনি কাবুল নদীর তীর ধরে কপিশ (কাফিরিস্তান), নগরহার (জেলালাবাদ), গান্ধার (পেশোয়ার) প্রভৃতি দেশ হয়ে উত্তর ভারতে আসেন।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত অঞ্চল পরপর তিনি পরিভ্রমণ করেন, সেগুলির একটি নির্বাচিত তালিকা নিচে উল্লেখ করা হল।

উত্তর ভারত—তক্ষশীলা, কাশ্মীর, জলন্ধর, মথুরা, স্থানেশ্বর, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বারাণসী, সারনাথ ইত্যাদি।

পূর্ব ভারত—গয়া, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, মগধ, নালন্দা, চম্পা, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি।

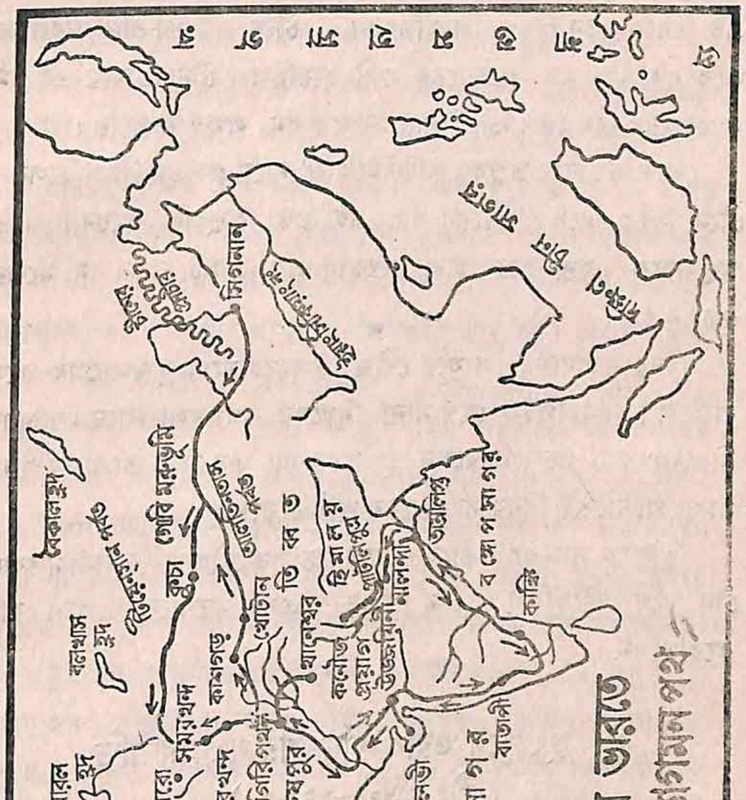
দক্ষিণ ভারত—কলিঙ্গ, কোশল, অন্ধ্র, কাঞ্চীপুর, মহারাষ্ট্র।

পশ্চিম ভারত—ভৃগুকচ্ছ, মালব, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু।

হিউয়ান-সাং মধ্য এশিয়ার পথে কাশগর, খোটান, নিয়া প্রভৃতি দেশ হয়ে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে চীনে ফিরে যান।

ভারত ভ্রমণের ফলাফল ঃ নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে তিনি বৌদ্ধদর্শন পড়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্রের

প্রায় ৭০০ পুথি তিনি চীনে নিয়ে গেছেন। ৭২ খানি গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।



চীনে হিউয়ান সাং এর প্রভাব : ভারতবর্ষ থেকে হিউয়ান-সাং চীন দেশে শুধুমাত্র নতুন পুঁথিপত্র নিয়ে যান নি, নতুন শিক্ষাধারাও নিয়ে গেছেন। তাঁর শিক্ষাধারার প্রভাবে চীনদেশে কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়—নালন্দায় হিউয়েন-সাং বৌদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর গ্রন্থাদি পড়েছিলেন। তাদের মত ও পথ যোগাচার দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শনের কিছু গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করছিলেন। এই বিষয়ে নতুন গ্রন্থও লিখেছিলেন। চীনে এই সব গ্রন্থ অবলম্বন করে এক নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। চীনা ভাষায় এই ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম ছিল ফা-সিয়াং, সংস্কৃতে ধর্ম লক্ষণ সম্প্রদায়।

কোশ সম্প্রদায় 'বসুবন্ধু অভিধর্মকোশ' নামে এক গ্রন্থ লিখেছিলেন। চীনে ফিরে এসে হিউয়েন-সাং, এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকে কেন্দ্র করে কোশ সম্প্রদায় নামে একটি নতুন ধর্ম মতের প্রচলন হয়।

বিনয় সম্প্রদায়—সে যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ কমে যাচ্ছিল। বিনয়পিটক গ্রন্থে নানা নিয়মের কথা বলা আছে। এসব নিয়মের কথা প্রচার করলেন হিউয়েন-সাং এর শিষ্য তাও সুৎয়াম। তাঁর প্রেরণাতেই বিনয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

হিউয়েন সাং-এর প্রভাবে ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের নানা মতবাদ চীন দেশে পৌছেছিল। চীন পণ্ডিতরা এসব মতবাদে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন।

৫. সুং যুগে ওয়াং আন-শির সংস্কারনীতি (খ্রীঃ ৯৬০—১২৮০)

অনেকে বলেন থাং যুগের শেষ এবং সুং যুগের শুরু আধুনিক চীন ইতিহাসের প্রথম পর্ব রূপে চিহ্নিত। সুং যুগের শাসননীতিতে কয়েকটি সংস্কারের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

১০৬৯ খ্রীস্টাব্দে চীনের সম্রাট শেন সুং একজন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। এই উপদেষ্টার নাম ছিল ওয়াং আন-শি। সরকারের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তি দেবার জন্য তিনি কয়েকটি সংস্কার চালু করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ সরকারের এক একটি এলাকার বিশেষ

বিশেষ উৎপন্ন জিনিস কিনে নিত। পরে অন্য এলাকায় সেগুলি বিক্রি করত। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন জিনিসের বিনিময় সহজ হত। জিনিসের দামও খুব বেশি ওঠানামা করত না, প্রায় স্থির থাকত। সরকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত বলে ব্যবসার লাভটুকু সরকারেরই থাকত।

চাষীদের জন্য সরকারী কৃষি ঋণ : শতকরা ২০ সুদে চাষীদেরকে সরকারী রাজকোষ থেকে ঋণ দেওয়া হত। সে যুগের তুলনায় এই সুদের হার খুবই কম ছিল বলতে হবে। এই সরকারী কৃষি ঋণের ফলে গরীব চাষীরা নিজেদের ভরণ পোষণ করতে পারত এবং খাজনা দিতে পারত। আগে অর্থ ধার দিয়ে মহাজনরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক অর্থলাভ করত। তাদের জায়গায় সরকার ধার দিতে লাগল বলে লাভের অংশটা রাজকোষে জমা পড়ত।

ভূমি কর : আগে জমিজমা ভোগ দখলের ব্যাপারে বহু রকমের অসাম্য ছিল। অসাম্য দূর করার জন্য নতুন জমি জরীপ করা হল। জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী ভূমি কর ধার্য করা হল। চাষীদের বেগার খাটা বন্ধ করা হল। গরীব চাষীদের আগে খুবই বেগার খাটতে হত। এখন বেগার খাটার বদলে তাকে খাজনা দিতে বলা হল। নতুন নিয়মে ধনীদেরকেই বেশি কর দিতে বাধ্য করা হল।

এই সব সংস্কারের ফলে চাষী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা নিঃসন্দেহে খুবই উপকৃত হয়েছিল। বড় বড় জমিদার, বণিক ও মহাজনরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

৬. সুং যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা ব্যবস্থা : সুং আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ ছিল পরীক্ষা পদ্ধতি। আইন, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য নানা বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হত। কিন্তু সবচেয়ে সম্মানজনক ছিল চিন শি পরীক্ষা। চিন-শি পরীক্ষায় পাশ করলেই উচ্চ সরকারী পদে চাকরী পাওয়া যেত। আগে পরীক্ষা নেওয়া হত অনিয়মিত ভাবে। ১০৬৫ সালের পর থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওয়াং আন-শি সংস্কার চালু করেছিলেন। সে সময় অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কমাবার জন্য তিনি সরকারী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা প্রচুর বাড়িয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে সরকার পরিচালিত পরীক্ষায় খুব বেশি সাহিত্যের জ্ঞান যাচাই করার প্রয়োজন নেই। শাসন সংক্রান্ত নীতির বাস্তব জ্ঞান পরীক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : নানা ধরনের শিল্পকলার জন্যও সুং যুগ বিখ্যাত ছিল। বারতলা প্যাগোদা ধরনের বাড়ি তৈরি হয়েছে। ধর্মের বিষয় নিয়ে ভাস্কর্যের নিপুণ কাজ করেছে সে যুগের শিল্পীরা। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণা তখন প্রায় অনুপস্থিত। তাই শিল্পকর্মে প্রাণের স্পর্শ ছিল না। সুং যুগে চীনা মাটির শিল্প সবচেয়ে উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল। চীনা মাটির শিল্প পরবর্তী যুগে আরও বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু সুং যুগের অলঙ্করণে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও তার তুলনা মেলে না।


লাল মাটির পাত্রে রঙিন অলঙ্করণ

চিত্রকলা : সুং যুগের সর্বোত্তম কৃতিত্ব চিত্রকলা। চিত্রকলায় চীনা শিল্পীর কুশলতা সুং যুগের আগেও ছিল, পরেও ছিল। কিন্তু চিত্রকলার সঠিক রীতি সুং যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন এই যুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু চিত্রকলায় ধর্মের স্থান তখন কমে আসছে। সুং যুগে চিত্রশিল্পীদের প্রিয় বিষয় ছিল মানুষ নয়, প্রকৃতি। প্রকৃতির বিশাল বিস্তার নয় ; তার ছোট ছোট অংশ। যেমন বাঁশ ঝাড় বা তৃণগুচ্ছ। সুং যুগের মানুষ শিল্প হিসাবেই চিত্রকলার সমাদর করত। সেখানে ধর্মের কথা আছে, সে কারণে নয়, চিত্রকলা বাড়ির শোভা বৃদ্ধি করে, সে কারণেও নয়।

৭. য়ুয়ান যুগের ইতিহাস

(খ্রীঃ ১২৮০-১৩৬৮)

মোঙ্গলদের পরিচয়ঃ মোঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা মোঙ্গল নামে পরিচিত। অধিকাংশ মানুষ ছিল যাযাবর। মুক্ত স্তেপভূমিতে ঘোড়ায় চড়ে তারা বেরিয়ে পড়ত। কেউ কেউ ছিল শিকারী ও মৎস্যজীবী। সাইবেরিয়ার অরণ্যের প্রান্তে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাস করত। যাযাবর জীবনে সব সময়েই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল। খাদ্যের সন্ধানে ও ধন সম্পদের সন্ধানে দেশ জয়ের অভিযান ছিল তাদের একমাত্র পেশা। অশ্বই ছিল তাদের যোদ্ধা জীবনের প্রধান অবলম্বন। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গোলিয়ার উপজাতিরা রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করল। চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন বীর যোদ্ধা ও কুশলী সংগঠক।

চেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্যঃ ১২০৫ থেকে ১২০৯ সালের মধ্যে চেঙ্গিস খাঁ সি সিয়া রাজ্যকে পদানত করেন। ১২১১ থেকে ১২১৫ সালের মধ্যে তিনি উত্তর চীনের চিন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। ১২১৯ থেকে ১২২১ সালের মধ্যে তুর্কী সাম্রাজ্য এবং বিশেষ করে বোখারা ও সমরখন্দ জয় করেন। ১২২৭ সালে চেঙ্গিস খাঁ মারা যান। মৃত্যুর সময় তিনি মধ্য এশিয়ায় একটি বিরাট মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়াতে মোঙ্গলরা খুব দ্রুত এগিয়েছিল। কিন্তু সমগ্র চীন জয় করতে তাদের প্রচুর সময় লেগেছিল। ১২৩৪ সালে উত্তর চীনের চীন বংশ একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। ১২৪১ থেকে ১২৫১ সাল—এই দশ বছর মোঙ্গলরা চীনে কোন অভিযান চালায় নি। দক্ষিণী সুং সাম্রাজ্য জয় করতে তাদের অনেকদিন ধরে বড় বড় যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

কুবলাই খাঁর পরিচয়ঃ কুবলাই খাঁ (খ্রীঃ ১২১৫—১২৯৪) ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর সবচেয়ে যোগ্য পৌত্র। ১২৬০ সালে তিনি মহান খাঁ (Great Khan) পদে অভিষিক্ত হন। তারপর ৩৪ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে দক্ষিণী সুং সাম্রাজ্য বিজয় সম্পন্ন হয়। তিনি পিকিংকে তাঁর শীতকালীন রাজধানীরূপে গড়ে তোলেন। ১২৭৬ সালে তাঁর সেনা বাহিনী ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে সুং সাম্রাজ্যের রাজধানী হাংচাও দখল করে। তারপর তারা ক্যানটন দখল করে। ১২৭৯ সালে ক্যানটনের দক্ষিণ পশ্চিমে বিরাট সুং নৌবাহিনী তারা ধ্বংস করে।



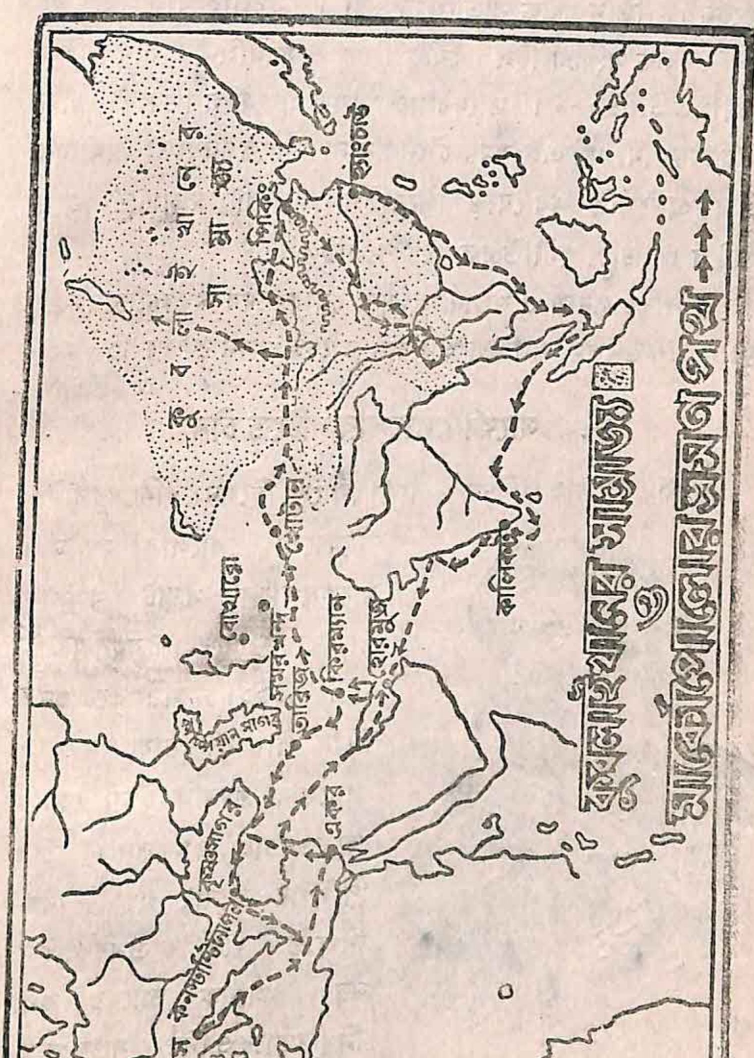
কুবলাই খাঁ

য়ুয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাঃ ১২৭১ সালে কুবলাই খাঁ চীনে এক নতুন রাজবংশের রাজত্বপ্রতিষ্ঠা করেন। য়ুয়ান বংশ নামে তা পরিচিত। চীনা ভাষায় য়ুয়ান মানে 'প্রথম শুরু' বা 'উৎপত্তি'। চীনে এই প্রথম এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল, যার নামের সঙ্গে কোন স্থান বা অঞ্চলের নাম জড়িত নয়। তখন থেকে কুবলাই খাঁ হলেন চীন সম্রাট। চীনা ইতিহাসে তাঁকে মরণোত্তর উপাধি 'শি সু' দেওয়া হয়েছে।

পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতিঃ চীনে মোঙ্গল শাসন ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম, তাওবাদ, নেসটোরীয় খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এবং কনফুসীয় মতবাদ—এসব ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলি করদান থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। এই সব ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের জমিজমা সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মঃ মোঙ্গলরা তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করেছিল। অষ্টম শতকে ভারতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন গুরু পদ্মসম্ভব। তিব্বতে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের এক বিচিত্র

সমন্বয় গড়ে ওঠে। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম কখনো কখনো লামাবাদ নামেও পরিচিত। মোঙ্গলরা তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম সাদরে গ্রহণ করেছিল।



ত্রয়োদশ শতকে সম্রাটের সমর্থন পেয়ে তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম খুব দ্রুত মোঙ্গোলিয়া ও চীনে ছড়িয়ে পড়ে।

তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঃ বৌদ্ধরা কুবলাই খাঁকে চক্রবর্তী উপাধি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল। তাদের মতে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী বৌদ্ধ সম্রাট। প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে তিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের স্রষ্টা। কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্যে ৪২,০০০ বৌদ্ধ সংগঠন ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ছিল অনুমানিক ২,১৩,০০০। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছিল তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী। এই সময় চীনের নানা অঞ্চলে তিব্বতী লামাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল। তারা অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। তারা দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধ পরিচালনায় ও শাসন সংগঠনে মোঙ্গলদের অতুলনীয় দক্ষতা ছিল। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে তাদের কোন কৃতিত্ব ছিল না।

৮. মার্কো পোলোর দৃষ্টিতে চীন

মার্কো পোলোর পরিচয় ঃ মার্কো পোলো ছিলেন **ভেনিসের** বণিক নিকোলো পোলোর সন্তান। মার্কোপোলো সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজদরবারে ১৭ বছর (খ্রীঃ-১২৭৫-১২৯২) চাকরি করেছেন। তিনি পারসিক ভাষা খুব ভাল জানতেন, এমনকি চীনা ভাষার চেয়েও ভাল জানতেন। তাঁর 'পৃথিবীর বর্ণনা', গ্রন্থটি বিশ্ব-বিখ্যাত। এটা ঠিক ভ্রমণকাহিনী নয়। অনেক জ্ঞানের কথা নিখুঁতভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায়নি। ইটালীয়, ল্যাটিন, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত প্রায় ১২০টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে।



মার্কো পোলো

মার্কো পোলোর বিবরণ ঃ তাঁর গ্রন্থে মার্কো পোলো প্রচুর চমকপ্রদ গল্প শুনিয়েছেন। ইউরোপের মানুষের কাছে তিনিই প্রথম চীনের ভূগোল, অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ পৌঁছে দিয়েছেন। মার্কো পোলোর গ্রন্থ থেকে একথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধের চীন নানা দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। ইউরোপের চেয়ে ভৌগোলিক আয়তনেই চীন বড় ছিল তা নয়, সভ্যতার বিকাশে ও বিজ্ঞানের কলাকৌশলেও চীন ইউরোপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অনেকে তাঁর বক্তব্যকে অবিশ্বাস্য মনে করেছে। নেপোলিয়ন সাগ্রহে তাঁর বই পড়েছেন এবং পাতায় পাতায় নানা মন্তব্য করেছেন। উনিশ শতকে তাঁর যাত্রাপথ অনুসরণ করে প্রতিটি বক্তব্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁর বহু বক্তব্য তাই আজ সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত।

স্মরণীয় তারিখ

খৃঃ ৬১৮-৯০৭ থাং যুগ
খৃঃ ৯৬০-১২৮০ সুং যুগ
খৃঃ ১২৮০-১৩৬৮ য়ুয়ান যুগ

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। থাং যুগে চীন সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?
২। চীনের জাতীয় বিদ্যালয়ে কারা পড়াশুনা করত?
৩। বড় চাকরি পেতে হলে কি পরীক্ষা দিতে হত?
৪। কনফুসীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমলাবাহিনী কি শিখেছিল?
৫। থাং যুগে কি কি বিষয়ে জ্ঞান চর্চা প্রচলিত ছিল?
৬। থাং যুগে সাহিত্যের ও গীতিকবিতার বিষয়বস্তু কি ছিল?
৭। চীনে চা পান জনপ্রিয় ছিল কেন?
৮। থাং যুগে চীনে কিভাবে বই ছাপা হত?
৯। চীনের শিল্পকলাতে কোন ধর্মের প্রভাব পড়েছিল?
১০। থাং যুগে বণিকদের নিজস্ব সংগঠনের কি নাম ছিল?
১১। থাং যুগে স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

S.C.E.R.T., West Library Calcutta 25/3, B. C. Road

১২। চীনে কি কি জিনিস আমদানি করা হত? চীন থেকে কি কি জিনিস রপ্তানি করা হত?

১৩। থাং যুগে কর ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল? এই পরিবর্তনের ফলাফল আলোচনা কর।

১৪। থাং যুগে বৌদ্ধ ধর্মসংঘ কি কি কাজ করত?

১৫। থাং যুগে রাষ্ট্র কিভাবে বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল?

১৬। থাং যুগে কেন বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন করা হয়েছিল?

১৭। থাং যুগে কোথায় কোথায় চীন সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল?

১৮। হিউয়ান-সাং কেন ভারতবর্ষে আসা মনস্থ করেন?

১৯। হিউয়ান-সাং ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্থান ভ্রমণ করেন, তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি স্থানের উল্লেখ কর।

২০। চীন দেশে হিউয়ান-সাং এর শিক্ষাধারার প্রভাবে, যে সব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, সেগুলির নাম উল্লেখ কর।

২১। ওয়াং আন-শি কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২২। সুং যুগে রাষ্ট্র কিভাবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল? তার ফল কি হয়েছিল।

২৩। সুং যুগে সরকারী কৃষি ঋণ ব্যবস্থার ফলে চাষীদের কি উপকার হয়েছিল?

২৪। সুং যুগে ভূমিকর ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

২৫। সুং যুগে ওয়ান আন-শি শিক্ষা ব্যবস্থায় কি সংস্কার চালু করেছিলেন?

২৬। সুং যুগে কোন ধরনের শিল্পকর্ম সবচেয়ে উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল?

২৭। মোঙ্গলদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২৮। চেঙ্গিস্ খাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান, লেখ।

২৯। কুবলাই খাঁ কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩০। চীনে য়ুয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর ধর্মনীতি ব্যাখ্যা কর।

৩১। বৌদ্ধরা কুবলাই খাঁকে আদর্শবাদী বৌদ্ধ সম্রাট মনে করতেন কেন?

৩২। মার্কো পোলো কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩৩। মার্কো পোলোর "পৃথিবীর বর্ণনা" গ্রন্থটি কেন বিশ্ববিখ্যাত?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। পামীরের ওপারে অকসাস উপত্যকার রাজ্যে, এমন কি—পর্যন্ত চীনের শক্তি প্রসারিত হয়েছিল।

২। থাং যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে—আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল।

৩। থাং যুগের সংগঠিত—চীন সভ্যতার একটি প্রধান কৃতিত্ব।

৪। —নামে এক ধরনের গীতি কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল।

৫। দশ শতকের মাঝামাঝি সমস্ত বৌদ্ধ—ও চীনের—সাহিত্য ছাপা হয়ে গেল।

৬। তবে একথা সত্য চিত্রকলাতেও—প্রভাব স্পষ্ট।

৭। বিরাট খাল খনন করে—ও পীত নদীর উপত্যকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটান হয়েছিল।

৮। গ্রামাঞ্চলে—প্রথার মধ্য দিয়ে ব্যবসা চলত।

৯। কিন্তু চিত্রকলার সঠিক—সুং যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

১০। সুং যুগে চিত্রশিল্পীদের প্রিয় বিষয় ছিল মানুষ নয়,—।

১১। ত্রয়োদশ শতকে — — নেতৃত্বে মঙ্গোলিয়ায় উপজাতিরা রাজনৈতিক — অর্জন করল।

১২। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম কখনো কখনো — নামেও পরিচিত।

১৩। ত্রয়োদশ শতকে সম্রাটের সমর্থন পেয়ে তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম খুব দ্রুত — ও — ছড়িয়ে পড়ে।

১৪। মার্কো পোলোর গ্রন্থ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধের চীন নানা দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে — ছিল।

খ. মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য ও জাপান

জাপান কথাটি এসেছে চীনা অক্ষর জি-পেন থেকে। জি-পেন কথাটির মানে যেখানে সূর্যোদয় হয়। জাপানীরা তাদের নিজেদের দেশকে বলে নিহন বা নিপ্পন। এই দুটি কথাও এসেছে জি-পেন থেকে। জাপান সূর্যোদয়ের দেশ।

১. সমাজ ও অর্থনীতি

মধ্যযুগের জাপান সুসংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। উজি নামে অনেক-গুলি গোষ্ঠীতে জাপান বিভক্ত ছিল। প্রতি উজির সভ্যরা ভাবত যে, তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর। প্রতি উজির একজন নেতা থাকত।

প্রতি উজির একজন করে নিজস্ব দেবতা থাকত। সেই নেতার অধীনে প্রতি উজির সভ্যরা তাদের দেবতার পূজা করত।

উজি ছাড়াও অন্য ধরনের সংগঠনও ছিল। সেগুলিকে বলা হত বে, অথবা তোমো। এগুলিও ছিল বংশানুক্রমিক সংগঠন। উজির মত প্রতি সংগঠনের নিজস্ব নেতা ছিল। এই সংগঠনগুলির অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব ছিল। সমাজের সব চেয়ে নিচে ছিল দাস শ্রেণী। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হত না।

ইয়ামাতো শাসকরা ছিল ইয়ামাতো উজির নায়ক। অন্যান্য উজিকে জয় করে তারা ক্ষমতা বাড়িয়েছিল। পঞ্চম শতকে ইয়ামাতো শাসকরা ১২১টি উজির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

উজিগুলি ছিল কৃষি ব্যাপারে স্ব-নির্ভর। অনেক তোমো সংগঠন ছিল কৃষকদের সংগঠন। তাদের সাহায্যে ইয়ামাতো শাসক অনেক ভূসম্পত্তি দখল করেছিল। সে যুগে জমি ছিল প্রচুর আর লোকসংখ্যা ছিল কম। তাই মানুষের সম্পদ বিচার করা হত, তার অধীনে কত জমি আছে তা দিয়ে নয়, কত লোক আছে তা দিয়ে।

২. চীনের সঙ্গে যোগাযোগ

জাপানে বৌদ্ধধর্ম : চীন থেকে জাপান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ জাপানের রাজবংশকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। জাপানের সাধারণ মানুষও কোরিয়ার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ধর্মান্তরিতকরণের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। ৬০৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা সোতকু সতেরো ধারার শাসনতন্ত্র চালু করেন। এই শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের, প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৬০৪ সালে সোতকু চীনের পঞ্জিকা জাপানে চালু করেন।

চীনে জাপানী দূত : রাজা সোতকু ৬০৭, ৬০৮ ও ৬১৪ সালে জাপান থেকে তিনবার চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। ৬৩০ থেকে ৮৩৮ সালের মধ্যে ১৩ বার জাপান থেকে চীনে দূত পাঠান হয়েছিল।

জাপানের ইতিহাসে দূতরা বিপুল পরিবর্তন এনেছিল। দূতদের সঙ্গে চীনে যেত নানা ধরনের মানুষ। তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষু, চীনা সাহিত্যের গুণী পণ্ডিত, চিত্র শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, অধস্তন রাজকর্মচারী ও আরও নানা শ্রেণীর জাপানী মানুষ চীনে যেত। কেউ বা দূতের সঙ্গে, কেউবা তার অনেক পরে জাপানে ফিরে আসত। চীনের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অনেক সম্পদ তারা জাপানে আমদানি করেছিল। চীনের থাং যুগের সঙ্গীত চীনে এখন হারিয়ে গেছে, কিন্তু জাপানী সঙ্গীতের ধারার মধ্যে তা বেঁচে আছে। এ থেকে বোঝা যায় কত গভীরভাবে জাপান চীনের সভ্যতা গ্রহণ করেছে।

জাপানে চৈনিক শাসন পদ্ধতি ও আইনের প্রচলন : ৬৪৬ সালে জাপানের সম্রাট একটি নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশ বলে তিনি বড় বড় সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা বাতিল করে দিলেন এবং চীনের থাং আমলের ভূমি ব্যবস্থার অনুকরণে কিছু সংস্কার চালু করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত রাজকর্মচারীর অধীনে প্রাদেশিক শাসন স্থাপন করা হল। জনসংখ্যার হিসাবে চাষীদের জমি বণ্টন করা হল। দেশজুড়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে পথঘাটের যোগাযোগ গড়ে উঠল। একই ধরনের কর প্রথা প্রবর্তিত হল। এসব সংস্কার রাতারাতি সম্ভব হয়নি। অনেকদিন ধরে এগুলি চালু করা হয়েছে। নিশ্চিন্তভাবে চীনের রাজনীতি ও অর্থনীতির ছাঁচে জাপান গড়ে উঠল। জাপানে আগে আইনের কোন ধারণাই ছিল না। চীনের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আইনের ধারণা গড়ে উঠল। সিনটো ধর্মের অলিখিত রীতিনীতিকেই জাপানের শাসকরা আইন বলে ভাবত। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে বিস্তারিত আইন লিপিবদ্ধ করা হল। আইনগুলি নানাভাবে বিভক্ত ছিল। যথা, শাস্তিমূলক আইন (রিৎসু), শাসন কাজের আইন (রীও), এবং অন্যান্য নানা ধরনের নিয়ম কানুন। আইনের এই সব বিভাগ চীনের থাং যুগের আইনের অনুকরণে লিখিত। তাছাড়া চীনের কনফুসীয় আদর্শমত আমলাতন্ত্র-নির্ভর শাসন ব্যবস্থা জাপানে প্রবর্তিত হয়।

উজি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া : সপ্তম শতকের সংস্কারগুলি জাপানে সবাই নতশিরে মেনে নেয় নি। স্বাধীন শক্তিশালী উজিরা খুব বাধা দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তারা বুঝবে পারল যে সংস্কারগুলি থেকে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। তখন তারা রাজদরবারে এসে সম্রাটকে সমর্থন জানাল। তারপর থেকে তারা সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন বিশেষ সুবিধাভোগী সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত হল।

৩. মিকাডো প্রধান পুরোহিত, প্রধান শাসক

জাপানের সম্রাটকে ইউরোপের লোকেরা "মিকাডো" বলে অভিহিত করেছে। জাপানীরা তাকে বলে তেনশি (স্বর্গপুত্র) বা তেন্নো (স্বর্গীয় রাজা)। জাপানী উপকথায় বলা হয়েছে যে মিকাডো হলেন জিম্মুর বংশধর। জিম্মু হলেন সূর্যদেবীর বংশধর। জিম্মু খ্রীস্টপূর্ব ৬৬০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাপানের প্রকৃত ইতিহাসে সম্রাটের শাসন শুরু হয়েছে ৭১২ সালে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ইয়ামাতো দল শক্তি অর্জন করেছে। ষষ্ঠ শতকের শেষে ইয়ামাতো শাসক নিজেকে সম্রাটরূপে ভাবতে শুরু করেছে। অন্যান্য উজির প্রধানকে সে ভাবত তাঁর অধীনস্থ রাজকর্মচারী।

সিনটো ধর্মমত : মধ্যযুগে জাপানের সম্রাট ছিলেন একই সঙ্গে প্রধান পুরোহিত ও প্রধান শাসক। জাপানের আদিম ধর্মবিশ্বাসের নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এবং চীনের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য জাপানী ধর্মমতকে বলা হয়েছে সিনটো। সিনটো কথাটির অর্থ দেবতার পথ। সিনটো ধর্মের মূল কথা দুটি : প্রকৃতি পূজা ও পুরুষের পূজা। সহজ প্রকৃতি পূজা থেকেই জাপানীদের ধর্মচিন্তা রূপ নিয়েছে। প্রকৃতির যা কিছু দেখেই তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, তাকেই তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছে। কখনো তা পাহাড় বা জলপ্রপাত, কখনো তা বড় গাছ বা বিচিত্র পাথর এবং এমনি অনেক কিছু। সিনটো ধর্ম বিশ্বাসে এ সব আরাধ্য বস্তুকে বলা হত কামি। প্রাচীনকালে যখন সম্রাটের ক্ষমতা

ও মান মর্যাদা বাড়তে শুরু করল, তখন সম্রাটকেও তারা কামি জ্ঞানে পূজা করতে লাগল। সিনটো ধর্মে নীতি কথার উপর জোর দেওয়া হয় নি ; জোর দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান পালনের উপর। পূর্ব পুরুষদের পূজার ব্যাপক অর্থ ছিল। প্রথমে সূর্য দেবীর পূজা। প্রাক্তন ও বর্তমান সম্রাট, জাপানের জীবনে দান রেখেছেন এমন মহানায়ক ও পণ্ডিত এবং প্রত্যেকের নিজস্ব পরিবারের পূর্ব পুরুষ—এদের পূজার যথাযথ বিধান ছিল সিনটো ধর্মমতে।

জাপানে সিনটো ধর্ম ছিল রাজশক্তির শক্ত ভিত্তি। ইয়ামাতো দলের প্রতিষ্ঠাতা সূর্যদেবীকে তাদের পূর্বপুরুষ মনে করত। তাই সিনটো ধর্মের প্রধান ছিলেন সূর্যদেবী। ইয়ামাতো দলের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান সমর্থন এসেছিল সিনটো ধর্মমত থেকে। সিনটো ধর্মমত অনুসারে সম্রাট ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। চীনা প্রভাবে নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাপানের সম্রাট অনেক নতুন রাজকীয় ক্ষমতা পেয়েছেন। চীন সম্রাটের মত জাপানের সম্রাটও হলেন শাসন বিভাগের সর্বেসর্বা। তাই বলা হয় জাপানের সম্রাট ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান শাসক।

৪. শোগানেটের উৎপত্তি

অষ্টম শতকে জাপানে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল। যাযাবর সমাজ ও উপজাতীয় সমাজের অবসান ঘটেছে। সমাজে স্থিতি ও স্বস্তি এসেছে। ৭০৮ সালে নারা ছিল জাপানের রাজধানী। ৭৯৪ সালে নারার অদূরে একটি নতুন শহরের পত্তন করা হয়েছিল। শহরের নাম কিয়োতো। ৭১৪ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত কিয়োতে ছিল জাপানের রাজধানী।

রাজসিংহাসন যাদের হাতে ছিল তারা ছিল অলস ও অকমণ্য। প্রকৃত শাসনক্ষমতা চলে এল রাজসভাসদদের একটি শক্তিশালী বংশের হাতে। এই বংশের নাম ফুজিওয়ারা বংশ। প্রায় চারশ বছর ধরে এই বংশ প্রচণ্ড দাপটে দেশ শাসন করেছে। কিন্তু তারাও অলস,

অকর্মণ্য ও অকেজো হয়ে পড়ল। তখন অন্যান্য বংশের হাতে চলে এল দেশের সামরিক আধিপত্য। এই বংশগুলির মধ্যে ক্রমে তায়রা ও মিনামোতো বংশ দুটি সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে ত্রিশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলে। তায়রাদের নেতা ছিলেন কিয়োমোরি। মিনামোতোদের নেতা ছিলেন ইয়োরিতোমো। ১১৮৫ সালে তায়রা বংশ যুদ্ধে হেরে যায়। তখন দেশের সর্বেসর্বা হলেন ইয়োরিতোমো। ১১৯২ সালে জাপানের সম্রাট তাঁকে উপাধি দিলেন সেই-ই-তাই-শোগান। এর মানে হল বর্বর জাতি বিজয়ী মহান সেনাপতি। তিনি শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন তা নয়; দেশের যাবতীয় ক্ষমতা দখল করলেন। কামাকুরা (ইয়েদো) নামে এক নূতন শহরে তিনি দপ্তর স্থাপন করলেন। এখন থেকে দ্বৈত শাসন চালু হল। কিয়োতোতে সম্রাট এবং কামাকুরাতে শোগান। আইনত সম্রাট ছিলেন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগানের হাতে। ১১৯২ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত জাপানে এই দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শোগান উপাধি বলে ইয়োরিতোমো জাপান সম্রাটের কাছ থেকে নিশ্চিত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সম্রাটের সামরিক প্রভুত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত শাসন ক্ষমতা ছিল। সম্রাটের কাছ থেকে শোগান উপাধি পাবার ফলে সামরিক ক্ষমতায় তিনি হলেন সম্রাটের প্রতিনিধি। শোগানের সামরিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ল। বংশানুক্রমিক সামরিক শাসনকে বলা হত শোগানেট। বংশানুক্রমিক সামরিক শ্রেণী বিশেষ বিশেষ সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। শোগানের বংশ পালটেছে। ইয়োরিতোমোর পরে হোজো বংশ, আশিকাগা বংশ এবং টকুগাওয়া বংশের হাতে শোগানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

৫. জাপানী সামন্ততন্ত্র

দাইমিও: শোগান ছিলেন বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি থেকে তিনি রাজস্ব পেতেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ সামন্ত

প্রভুদের বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সময় শোগানকে তারা সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তারা ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। এই সামন্তপ্রভুদের বলা হত দাইমিও। দাইমিওরা তাদের নিজেদের অঞ্চলে প্রায় রাজার হালে থাকতেন। সুরক্ষিত দুর্গে তারা বাস করতেন। হাজার হাজার সেনা তাদের এক এক জনের অধীনে থাকত। সৈন্যদের যুদ্ধের পেশা ছিল বংশগত। দাইমিও যুদ্ধের প্রয়োজনে শোগানকে সৈন্য জোগাত। দাইমিও ছিল শোগানের প্রতি অনুগত। ইউরোপের সামন্তপ্রভুদের মত নিজের অঞ্চলে দাইমিও ছিলেন প্রায় স্বাধীন। তিনি আইন প্রণয়ন করতেন, দেশ শাসন করতেন এবং অপরাধীদের বিচার করতেন। নিজের অঞ্চলে নিজস্ব মুদ্রাও চালু করতেন।

সামুরাই ঃ যোদ্ধাদের বলা হত সামুরাই। তাদের পেশাই ছিল যুদ্ধ। দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে একমাত্র তারাই অস্ত্রধারণ করতে পারত। একমাত্র নিজেদের সামন্তপ্রভুর কাছেই তারা অনুগত থাকত। পূর্বে সামুরাই কথাটির দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সামরিক শ্রেণীকে বোঝান হত। এই শ্রেণী বুশি নামে পরিচিত। পরে সমগ্র সামরিক শ্রেণী বোঝাতে সামুরাই ব্যবহার করা হয়েছে। দাইমিও থেকে সাধারণ পদাতিক সবাই ছিল সামুরাই শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃষক, কারিগর ও বণিক শ্রেণী থেকে সামুরাই শ্রেণীকে অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

বুশিদো ঃ বুশি থেকে বুশিদো কথাটি এসেছে। জাপানী যোদ্ধার রীতিনীতিকে বলা হত বুশি। বুশিদো মানে যোদ্ধার আচার আচরণ। জাপানী যোদ্ধারা ছিল সাহসী ও অনুগত। তারা সুদৃশ্য পোশাক ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত। তারা ছিল সহজ, সরল ও মিতব্যয়ী। তাদের অনেকেই ছিল নিরক্ষর। কেউ কেউ চীনা ভাষায় লিখতে পড়তে পারত। চীনা ভাষায় যাদের দখল ছিল, তাদের গর্বের সীমা ছিল না। ইউরোপের নাইটদের সঙ্গে তাদের অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে কোন মিল ছিল না।

ইউরোপের নাইটরা মেয়েদের খুব সম্মান করত, মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করত। জাপানী যোদ্ধাদের এ ধরনের রীতিনীতি মানতে হত না।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ ৬০৪ জাপানের শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধধর্মের স্বীকৃতি

খ্রীঃ ৭৯৪ জাপানের রাজধানী কিয়োতো শহরের পত্তন

খ্রীঃ ১১৯২ শোগানেটের উৎপত্তি

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগের জাপানের উজি ও তোমি গোষ্ঠির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। মধ্যযুগের জাপানে কৃষিব্যবস্থা কি ধরনের ছিল?

৩। জাপানে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়েছিল?

৪। চীনে প্রেরিত জাপানী দূতরা জাপানে কি পরিবর্তন এনেছিল?

৫। জাপানে কিভাবে চৈনিক শাসন পদ্ধতি ও চীনা আইন প্রচলিত হয়েছিল?

৬। কিভাবে জাপানে উজি সম্প্রদায় সুবিধাভোগী সামন্তশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল?

৭। জাপানের সম্রাটকে ইউরোপের লোকেরা কি নামে অভিহিত করেছে?

৮। সিনটো ধর্মের মূল কথা কি? সিনেটা ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৯। জাপানের সম্রাটকে কেন বলা হয় রাজ্যের প্রধান পুরোহিত ও প্রধান শাসক?

১০। কত বছর কিয়াতো ছিল জাপানের রাজধানী?

১১। কিভাবে জাপানে শোগানেট শাসন প্রবর্তিত হয়েছে?

১২। কিভাবে জাপানে দ্বৈত শাসন চালু হয়েছিল? কতদিন তা চলেছিল?

১৩। জাপানে কাদেরকে দাইমিও বলা হত? তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? তারা কি কি কাজ করত?

১৪। জাপানে সামুরাই শ্রেণী বলতে কাদের বোঝান হত?

১৫। বুশিদো মানে কি? ইউরোপের নাইটদের সঙ্গে জাপানের যোদ্ধাদের তফাৎ কোথায়?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। তাই মানুষের সম্পদ বিচার করা হত, তার অধীনে কত — আছে তা দিয়ে নয়, কত — আছে, তা দিয়ে।

২। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় — ঘটনা আর কখনো ঘটে নি।

৩। তাছাড়া চীনের — আদর্শমত — শাসনব্যবস্থা জাপানে প্রবর্তিত হয়।

৪। মধ্যযুগে জাপানের সম্রাট ছিলেন একই সঙ্গে প্রধান — ও প্রধান —।

৫। সম্রাটের কাছ থেকে — উপাধি পাবার ফলে সামরিক ক্ষমতায় তিনি হলেন সম্রাটের —।

৬। কৃষক, কারিগর ও বণিক শ্রেণী থেকে — শ্রেণীকে অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

৭। জাপানী যোদ্ধার রীতিনীতিকে বলা হত—।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের ভারত

১. হুনদের ভারত অভিযান

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি হুনরা উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে ইউ-চিদেরকে বিতাড়িত করে। কিছুদিন পর তারা পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়। হুনদের একটি শাখা ইউরোপে অভিযান চালিয়েছিল। তাদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি তাদের আর একটি শাখা অক্‌সাস উপত্যকায় বসতি বিস্তার করে। ইতিহাসে তারা শ্বেত হুন নামে পরিচিত। খ্রীস্টীয় ৪৫৮ সালের আগে শ্বেত হুনরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। কালক্রমে তারা কাবুল ও পারস্য দখল করে। ৪৮০ সালে তারা পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজা ফিরোজকে হত্যা করে। পারস্য বিজিত হলে শ্বেত হুনরা এক বিরাট সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের রাজধানী ছিল বাল্‌কা।

স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয় পড়ে। তখন হুনরা ভারত বর্ষ আক্রমণ করে। তাদের নেতা ছিলেন তোরমান। তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিরাট অংশ দখল করেছিলেন। ৫১০ খ্রীস্টাব্দে ভানুগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করেন।

তোরমানের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনি ইতিহাসে রক্তপিপাসু অত্যাচারী শাসক হিসাবে পরিচিত। অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ ও সংঘ তিনি ধ্বংস করেছিলেন। গোয়ালিয়র পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। মান্দাসরের যশোধর্মন ৫৩৩ সালে তাঁকে পরাজিত করেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য তাঁকে পরাজিত করেন, বন্দী করেন এবং পরে মুক্তি দেন। হুন উৎপীড়নের হাত থেকে মধ্য ভারতকে রক্ষা করেন বালাদিত্য। মিহিরকুল পরে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। কূটকৌশলে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন দখল্ করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট অঞ্চলে ছিল মিহিরকুলের রাজধানী। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি তাঁর রাজত্বের অবসান ঘটে। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হুনদের কোন যোগ্য নেতা ছিল না। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিও কমতে শুরু করল। তবু ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতের রাজারা হুনদের আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল।

হুন অভিযানের গুরুত্ব: পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের হুন অভিযান উত্তর পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হুন অভিযানের ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। এটা হল হুন অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফল। হুনরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষা শিখেছে, এবং ধর্মকে গ্রহণ করেছে। হুনরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে। এইভাবে হুন অভিযানের ফলেই পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয় রাজপুতদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এটা হল হুন অভিযানের সামাজিক ফলাফল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর যে সব সম্রাট রাজত্ব করেন, তাঁরা হলেন কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত

বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত এবং বুধগুপ্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিধি খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। রাজধানী থেকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং দূরতম অঞ্চলে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খুব শক্ত ও সমর্থ বীর ছিলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যকে সুশাসনে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পর থেকে যে গুপ্ত রাজারা এলেন, তাঁরা ছিলেন দুর্বল ও স্বার্থপর। বিপুল হুন বাহিনীর আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বাংলা, কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে গেল।

হর্ষবর্ধনের যুগ

থানেশ্বর ছিল পুষ্যভূতিবংশের আদিত্যবর্ধনের অধীনে করদ রাজ্য। আদিত্যবর্ধনের পুত্রের নাম প্রভাকরবর্ধন। প্রভাকরবর্ধনের অধীনে থানেশ্বর শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ৬০৫ সালে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেছিলেন।


হর্ষবর্ধন

প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। থানেশ্বর ও কনৌজের শাসনভার তিনি যখন গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সামনে ছিল নানা বিপদ আপদ। তা সত্ত্বেও তিনি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ছিলেন বহু গুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও দক্ষ শাসক। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন এবং ধর্মমতে উদার ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও সুকবি ছিলেন। 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' এই তিনটি নাটক তিনি রচনা করেন। কবি বাণভট্ট

তার সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বাণভট্ট 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এই দুটি গ্রন্থের লেখক। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে সে যুগের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাং বলেছেন যে হর্ষের আমলে সম্রাটের ভূসম্পত্তির রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করা হত জ্ঞানের চর্চায়।

উত্তরাপথনাথ: হর্ষবর্ধনের রাজ্যের বিস্তৃতি নিয়ে মতভেদ আছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, প্রয়াগ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু, বলভী, কাশ্মীর হর্ষের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন ছিল না। তারা হর্ষের প্রভাব প্রতিপত্তি স্বীকার করে নিয়েছিল। পাঞ্জাব ও মালবের কোন কোন রাজা এবং কামরূপের ভাস্করবর্মন হর্ষের আনুগত্য স্বীকার করতেন। মৌর্য সাম্রাজ্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মত হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল না। এমন কি উত্তর ভারতের সর্বত্র তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠতম রাজা ছিলেন। এইজন্য তাঁকে সকলোত্তরপথনাথ বলা হত। এতদিন পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল সমস্ত ভারতের একাধিপত্য। সপ্তক শতকে সে আদর্শ সমস্ত ভারত থেকে সকল উত্তরপথে নেমে এসেছে।

৩. হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ

হিউয়েন-সাং মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মের সমাদর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানকার রাজ্যগুলির শাসকবৃন্দ তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বাল্‌ক ও বামিয়েনে তিনি অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। এক একটি বৌদ্ধসংঘে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভগবান বুদ্ধের পূজা করতেন। কাবুলেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অম্লান। বুদ্ধের জীবনের কোন না কোন অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ স্তূপ ও সৌধ নির্মিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শহর ও গ্রামগুলি তখন জনশূন্য ছিল। পেশোয়ার ছিল নানা শস্য ও ফলের উৎপাদনে

সম্পদশালী। সেখানে আখ থেকে চিনির উৎপাদন দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। কাশ্মীর ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। সেখানেও তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ দেখেছিলেন। সেখানে বৌদ্ধসংঘে বাস করত অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু। কাশ্মীরের রাজা তাঁকে খুব সম্মান দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় পুস্তকগুলির প্রতিলিপি লেখার জন্য কাশ্মীরের রাজা তাঁকে ২০ জন লিপিকার দিয়েছিলেন। হিউয়ান-সাং কাশ্মীরে দু'বছর ছিলেন।

তিনি লিখেছেন যে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের আশেপাশের অঞ্চলগুলি বহুদিন ধরে ধর্মক্ষেত্ররূপে পরিচিত। মথুরা থেকে কান্যকুব্জ যাবার পথে তিনি গঙ্গানদী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে যুগের মানুষরা বিশ্বাস করত যে একবার গঙ্গা স্নান করলে মানুষের সঞ্চিত পাপ দূর হয়; গঙ্গাগর্ভে মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুনর্জন্ম হয় স্বর্গে এবং গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিলে মানুষের আত্মা বিপথগামী হয় না।

গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের সময় হিউয়ান-সাং জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই দস্যুরা দুর্গার আরাধনা করত এবং নরবলি দিত। হিউয়েন সাংকে তারা দুর্গার কাছে বলি দেবে স্থির করল। এতে তিনি এতটুকুও ভীত হন নি। শুধু বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলেন। বহু দূর দেশ থেকে এই সাধু মানুষটি এদেশে এসেছেন শুনে দস্যুরা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তাঁর লুণ্ঠিত জিনিস ফিরিয়ে দিল।

প্রয়াগে তিনি অল্প কয়েকজন বৌদ্ধ দেখেছিলেন। শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, সারনাথ, গয়া, বৈশালী, পাটলিপুত্র এবং রাজগৃহ প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থান তিনি দর্শন করেছিলেন। এই সমস্ত বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি তখন প্রায় জনশূন্য ছিল। অশোক নির্মিত স্তূপগুলি তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বারাণসী ছিল জন সমাগমে মুখর এবং সম্পদশালী। অধিকাংশ লোকেই শিবের পূজা করত এবং ব্রাহ্মণকে সম্মান করত। বুদ্ধের অনুরাগী ছিল না বললেই চলে। সাধুরা শহরময় ঘুরে বেড়াতেন। কেউ ছিলেন উলঙ্গ; কেউ ছিলেন ভস্মচ্ছাদিত। অধিকাংশই ছিলেন হঠযোগী।

মগধে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। নালন্দার মহাবিহারে অধিকাংশ

সময় তিনি কাটাতেন। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রেও তিনি অশোক নির্মিত অনেক বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। এখানকার মানুষরা ছিল গর্বিত ও রণপ্রিয়। দয়াদাক্ষিণ্য পেলে তারা কৃতজ্ঞতাবোধ করে। দুঃখী মানুষের কল্যাণে তারা সর্বদাই আত্মত্যাগে উৎসুক। কিন্তু অন্যায় দেখলে বা অপমানিত হলে তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। মালবের মানুষদের দেখেও তিনি মুগ্ধ হন। তারা ভদ্র, নম্র এবং বুদ্ধিমান। কথায়, আচরণে ও শিক্ষায় তারা রুচিশীল।

হর্ষের অনুরোধে হিউয়েন-সাং কনৌজে বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। হর্ষের সঙ্গে ছিলেন ১৮ জন অধস্তন রাজ, ৩০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ২০০০ ব্রাহ্মণ। ১০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন নালন্দার বিহার থেকে। একটি বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাবে ছিল বুদ্ধের স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি। প্রথমে রাজা হর্ষ এবং তারপর সমস্ত সমাবেশ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপহার বিতরণ করা হয়। রাজার অনুরোধে হিউয়ান সাং এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। হিউয়েন সাং-এর বক্তৃতা শুনে মহারাজ হর্ষ বলেছিলেন, যেমন করে সূর্যের আলোয় জোনাকি পোকার ক্ষীণ আলো মিলিয়ে যায় এবং শ্রমিকের হাতুড়ির শব্দ বজ্রের শব্দে মিলিয়ে যায়, তেমনি, চোখের পলকে হিউয়েন সাং-এর কথায় সবকিছু ভুলভ্রান্তি দূর হয়ে গেছে।

হর্ষের অনুরোধে তিনি প্রয়াগের কুম্ভ মেলাতেও আসেন। রাজার হাত থেকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে হয়েছিল। প্রথম দিন বুদ্ধের স্বর্ণমূর্তি নিয়ে, দ্বিতীয় দিন সূর্যদেবতা নিয়ে এবং তৃতীয় দিন শিব নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। ৭৫ দিন ধরে দানপর্ব চলেছিল। হিউয়েন সাংকে ১,০০০ স্বর্ণ খণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই দান তিনি অগ্রাহ্য করলেন। কারণ তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন জ্ঞানের অন্বেষণে, ধনের লোভে নয়।

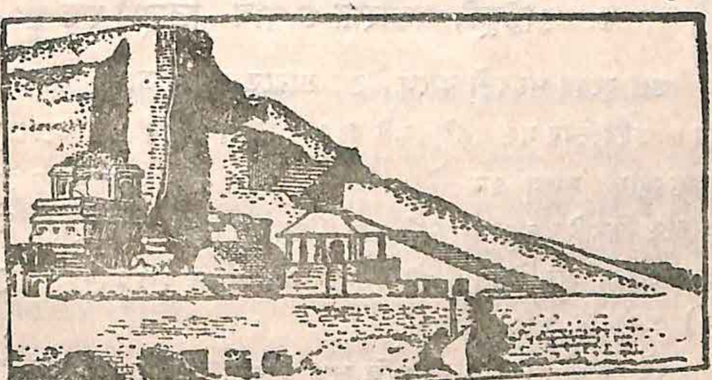
হিউয়েন সাং-এর বিবরণে ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজজীবনের ততটা নয়। কারণ ধর্ম বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। ভারতবর্ষের প্রধান চারিটি জাতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের চর্চা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিধবা বিবাহের প্রচলন খুব একটা ছিল না। দেশের প্রধান প্রধান ঘটনা লিখে রাখার জন্য সরকার বিশেষ লিপিকার নিয়োগ করেছিল। হিউয়েন সাং স্বয়ং এইসব লেখা থেকে ভারতবর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন।

হিউয়েন-সাং লিখেছেন যে ভারতবর্ষ প্রায় ৭০টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। রাজার সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী, রথবাহিনী ও হস্তিবাহিনী। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরান ধাঁচের।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে ধর্মে ধর্মে বিরোধ ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয় ও নীতিপরায়ণ ছিল।

৪. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা ছিল মগধ রাজ্যের অন্তর্গত। হিউয়েন সাং এর ভারত আগমনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। তাই তাঁর বিবরণে নালন্দা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঞ্চলে ছয়টি বৌদ্ধমঠ ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন ছয়তলা বাড়িতে। নালন্দায় ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। চীন, তাতার, কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে ছাত্ররা এখানে আসত নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতে। কয়েকজন রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের হাতে ছিল ছাত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব। এখানে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার খুব সহজ ছিল না। কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের নির্বাচন করা হত। প্রতি দশজনের মধ্যে মাত্র দু'একজন এখানে পড়াশুনার সুযোগ পেত।

নালন্দায় অনেক আচার্য অধ্যাপনা করতেন। ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, গুণমতি তাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিউয়েন-সাং-এর সময়ে প্রধান আচার্য ছিলেন মহাজ্ঞানী শীলভদ্র। প্রশ্নোত্তর, তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। সেখানে বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। তিব্বতী গ্রন্থে রত্নোদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক—এই তিনটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে নালন্দায় শিক্ষা দেওয়া হত। বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রও শেখান হত।

৫. রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পাল—ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব

গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নি। হর্ষবর্ধনের মত কেউ কেউ বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সফল হন নি। ৭৫০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে তিনটি বড় রাজ্য আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়েছিল। এই তিনটি বড় রাজ্য হল: (১) রাষ্ট্রকূট, (২) প্রতীহার ও (৩) পাল।

এই তিনটি রাজ্য অনেকগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধ করে এই তিনটি রাজ্যই কনৌজ দখল করতে চেয়েছিল। কনৌজ ছিল হর্ষের রাজধানী। কনৌজের অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কনৌজ দখলে

থাকলে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কনৌজ দখলের যুদ্ধে ঐ তিনটি রাষ্ট্র অবতীর্ণ হয়েছিল।



রাষ্ট্রকূট : এই সময়ে উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল রাষ্ট্রকূটদের রাজ্য। অমোঘবর্ষ ছিলেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি মালখেদ বা মান্যক্ষেত্র নগরে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। অমোঘবর্ষ চেয়েছিলেন উত্তর ভারতেও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা।

প্রতীহার : প্রতীহাররা এই সময় অবন্তী ও দক্ষিণ রাজস্থানের কোন কোন অংশ শাসন করত। আরব আক্রমণকারীরা তখন

সিন্ধুদেশ থেকে রাজপুতানা ও উজ্জয়িনীর দিকে এগিয়ে এসেছিল। প্রতীহারগণ আরবদের পরাজিত করে এবং অষ্টম শতকের শেষে কনৌজ দখল করে।

পালঃ বাংলাদেশের পাল রাজারাও কনৌজ দখল করতে চেয়েছিলেন। পালবংশ বাংলাদেশে প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছিল। সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিহারের অনেকটা জুড়ে তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাদের প্রথম রাজা গোপাল সামন্তবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালরাজাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে রাষ্ট্রকূটদের রাজা তাঁকে পরাজিত করেন। ধর্মপাল তাঁর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে কনৌজ আক্রমণ করলেন। রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাল রাজারা তিনটি পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন। প্রতিবেশি রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। পাল রাজারা দীর্ঘ দিন কনৌজকে ধরে রাখতে পারেন নি।

রাজা ভোজের আমলে (খ্রীঃ ৮৩৬-৮৮২) প্রতীহার শক্তি উত্তর ভারতে চমক সৃষ্টি করেছিল। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তিনি কনৌজ পুনরায় দখল করলেন।

৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরা হারান শক্তি ফিরে পায়। পুনরায় তারা কনৌজ আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে এই তিনটি রাজ্য অনুভব করতে পেরেছে যে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন যুদ্ধে মগ্ন ছিল বলে তারা জানতেই পারে নি কি নিদারুণ দুর্বল তারা হয়ে পড়েছে। ফলে একশ বছরের মধ্যে তিনটি রাজ্যই পতনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

৬ রাজপুতদের উদ্ভব

রাজপুতদের উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে রাজপুতরা মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিদেশী উপজাতির

বংশধর। রাজপুতরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। প্রাচীন ভারতের সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বংশধর হিসাবে রাজপুতদের অনেকেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু চারটি গোষ্ঠী দাবী করেছিল যে তারা সূর্যবংশীয় নয়, চন্দ্রবংশীয়ও নয়। তারা 'অগ্নিকুলোদ্ভব'। এই চারটি রাজপুত বংশ হল পাওয়ার, পরিহার, চৌহান এবং সোলাঙ্কি। অনেকে বলেন অগ্নিকুলোদ্ভব কথাটি একটি বিশেষণ মাত্র। এই বিশেষণের তাৎপর্য হল বিদেশী জাতিকে অগ্নিশুদ্ধ করে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই চারটি অগ্নিকুল জাতি পশ্চিম ভারত এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের কোন কোন অঞ্চলে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরিহাররা কনৌজ অঞ্চল শাসন করত। চৌহানদের আধিপত্য ছিল মধ্য রাজস্থানে। কাথিওয়াড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোলাঙ্কিরা রাজত্ব করত। পাওয়ারদের কর্তৃত্ব ছিল মালব অঞ্চলে। ইন্দোরের কাছে ধর ছিল তাদের রাজধানী। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের অধীনে এই সমস্ত বংশ প্রথমে ছোটখাটো রাজার মত দেশ শাসন করত। কালক্রমে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

৭. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কলহ

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। যেমন নেপালে, কামরূপে (আসামে), কাশ্মীরে, উৎকলে (উড়িষ্যায়), পাঞ্জাবের পাহাড় অঞ্চলে অনেকগুলি রাজ্য এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলির মধ্যে চম্পক, জম্বু ও কুলু অন্যতম। কিন্তু এগুলি রাজপুত ইতিহাসের অন্তর্গত নয়। মধ্য ভারত ও রাজস্থানের অনেকগুলি রাষ্ট্র রাজপুত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ছিল। যেমন বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লা এবং মেবারের গুহিলাদের রাজ্য। চৌহানদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ছিল টোমারদের আধিপত্য। তাঁরা হরিয়ানায় এবং দিল্লীর আশেপাশের অঞ্চলে রাজত্ব করেছে। তারা ছিল প্রতীহারদের অধীনে। প্রতীহার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে, তারাও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এই সমস্ত রাজ্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে

শক্তিক্ষয় করছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, এই সমস্ত রাজ্য উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি।

এইসব রাজ্যের পরস্পর বিবাদের মধ্যে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চেহারা স্পষ্ট। রাজার সঙ্গে তার সামন্তবর্গের সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই মধুর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামন্তবর্গের উপর রাজার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল খুবই শিথিল। ইচ্ছা করলেই সামন্তরা রাজাকে বিপদে ফেলতে পারত। প্রয়োজনের সময় তাঁরা রাজাকে তাদের রাজস্বের অংশ পাঠাত না বা সৈন্যবাহিনী সরবরাহ করত না। সামন্তদের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল রাজা কখনই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। কখনও কখনও রাজা সামন্তদের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারত। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা খুব একটা ঘটে নি। কারণ সামন্তরা ছিল ক্ষমতামত্ত। তাদের সঙ্গে আচরণে রাজারা খুব সতর্ক হয়ে চলত।

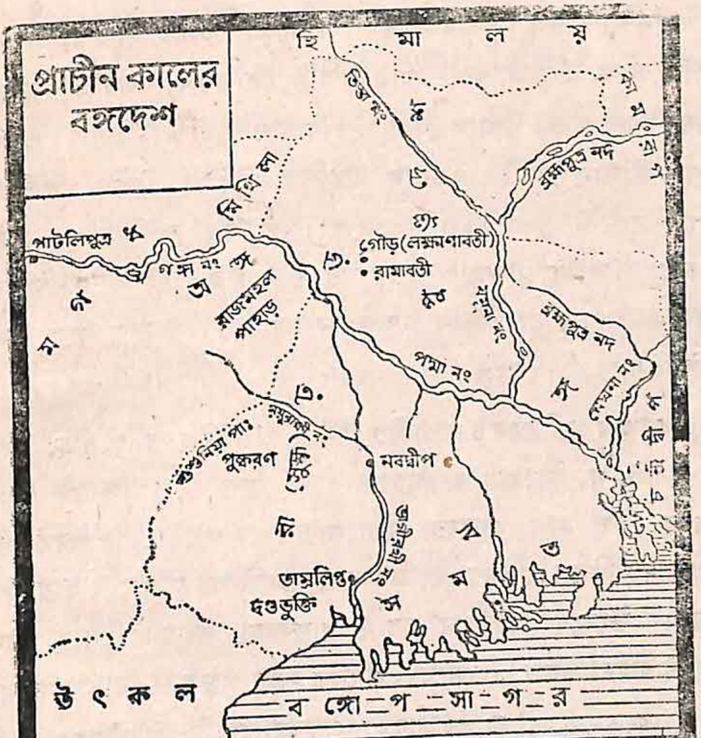
সামন্তরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। একই রাজার অধীনে সামন্ত হওয়া সত্ত্বেও, তারা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই সামন্তদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। যুদ্ধ ছিল তাদের পেশা। যুদ্ধেই তাদের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ ছিল রাজস্বের অপব্যয়ের পথ।

প্রবল সামন্তরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রায়ই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করত। রাষ্ট্রকূট ছিল চালুক্যদের সামন্ত। পরে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং চালুক্য শক্তিকে পরাভূত করে। প্রতীহারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চান্দেল্লা স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় সামন্তরা খুব বড় বড় উপাধি গ্রহণ করত। যেমন, রাজাধিরাজ। এই উপাধিগুলি ছিল অর্থহীন শব্দমাত্র। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে উপাধিগুলির অর্থের কোনোই সঙ্গতি ছিল না। তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্বের আদর্শ।

৮. বাংলাদেশ—পাল ও সেনযুগে সমাজ জীবন

রাজা শশাঙ্ক ঃ শশাঙ্ক ছিলেন **মহাসামন্ত**। কার মহাসামন্ত ছিলেন, তা বলা কঠিন। সম্ভবত ৬০৭ খ্রীস্টাব্দের আগে কোন সময়ে তিনি গৌড়ের স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। **কর্ণসুবর্ণ** ছিল তাঁর রাজধানী। কর্ণসুবর্ণ এখন মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকট কানাসোনা গ্রাম। দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও কঙ্গোদ



(উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) তিনি জয় করেন। পশ্চিমে মগধ ও পূর্বে বঙ্গরাজ্য তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। হর্ষবর্ধনের মত শক্তিশালী রাজাও তাঁর শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা দেশকে উত্তর ভারতে **স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়** প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাজ তখন ছিল **ভূমি নির্ভর** এবং **কৃষি নির্ভর**। যাদের জমি-ছিল, তাদের অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ। ভূমিহীন গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমিকদের

আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তখনকার সাহিত্যে, বিশেষ করে চর্যাগীতিতে দরিদ্র মানুষের অভাব অনটনের চিত্র খুব স্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। তারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল। ভূমিই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। ভূমির উপর ব্যক্তিগত ভোগের অধিকার ছিল স্বীকৃত। শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি সমাজে ও রাষ্ট্রে তখন ছিল না।

তখন **ধান** ছিল প্রধান শস্য। তাছাড়া তুলা, সরিষা, পান, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, লেবু প্রভৃতি বহু রকম ফলের চাষ হত। আখের চাষও হত। আখ থেকে তৈরি হত গুড় ও চিনি। সেগুলি বিদেশে চালান যেত। বাংলার **বস্ত্রশিল্প** বিখ্যাত ছিল। সূতীবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হত। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার, তৈলকার—এই সব কারিগররা **নিজস্ব সংঘ** গড়ে তুলেছিল। অনুমান করা হয় সংঘগুলি পরে নানা জাতি হিসাবে রূপ নেয়।

এখনকার মত তখনও বাঙালীর **প্রধান খাদ্য** ছিল ভাত, মাছ, মাংস শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত নানা দ্রব্য। **পোশাকে** কোন আড়ম্বর ছিল না। পুরুষরা মালকোচা দিয়ে খাটো ধুতি পরত এবং গায়ে চাদর দিত। মেয়েরা শাড়ি পরত, চোলি পরত এবং মাথায় দিত ওড়না। উৎসবে অনুষ্ঠানে সবাই সাজসজ্জা করত। মেয়ে পুরুষ উভয়েই গয়না পরত। মেয়েরা শাঁকের বালা পড়ল। নানা ধরনের খোঁপা করতে মেয়েরা ভালবাসত। পুরুষরা বাবরি চুল রাখত। ধনী দের মধ্যে মণিমুক্তা ও দামী অলঙ্কারের প্রচলন ছিল।

পূজা পার্বন উৎসব অনুষ্ঠান নিত্যই লেগে থাকত। হোলি, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, আকাশ প্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, কোজাগরী পূর্ণিমা পালন—এসব অনুষ্ঠান মধ্যযুগের বাংলাতেও প্রচলিত ছিল।

মেয়েদের মধ্যে **অবরোধ প্রথা** ছিল না বলেই মনে হয়। **বিধবা বিবাহ** সমাজে স্বীকৃত ছিল না। **সতীদাহ প্রথা** প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশে প্রচলিত হিন্দু আইনকে বলা হয় দায়ভাগ। জীমূত

বাহন ‘দায়ভাগ’ গ্রন্থের লেখক। পালযুগের বাংলা দেশে **স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার** ছিল, জীমূতবাহনের লেখা থেকে তা জানা যায়। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে হিউয়ান-সাং যা বলেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা মনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন, ‘সমতটের লোক স্বভাবত শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্ত-বাগীশ, এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক।”

৯. পাল ও সেনযুগে ধর্মচর্চা

পালযুগে বাঙালী নিজস্ব স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করেছিল। চারশ বছর এই স্বাধীনতা তারা ভোগ করেছিল। ধর্মপাল মহীপাল ও দেবপাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই সাম্রাজ্য বিস্তারে বাঙালী **ভারতীয় চেতনা** লাভ করেছিল। পাল রাজারা নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী ও সারনাথ অঞ্চলের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ জগতে বাংলা দেশ গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পালযুগে বাংলা দেশে **সামগ্রিক ঐক্যবোধ** জেগে ওঠে। এটাই পালযুগের **সর্বশ্রেষ্ঠ দান**।

পাল রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ, পরম সুগত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও তারা রক্ষক ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন কর্মে, এমন কি মন্ত্রী ও সেনাপতি হিসাবে, ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তরাও স্থান পেয়েছিল। এই সামাজিক সমন্বয় ও মিলন পালযুগেই সম্ভব হয়েছিল। **এই সমন্বয় ও মিলনই** বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি। এটাও পাল যুগের **অন্যতম দান**।

সেন রাজবংশ বাংলার নয়। তাঁরা দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন। বাঙালী জনসাধারণ কখনই সেন রাজবংশকে আপনজন ভাবতে পারে নি। পাল রাজারা মুখ্যত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। পাল আমলে সমাজের নিচুস্তরের মানুষ অর্থাৎ কৃষক ও চণ্ডালদের উপর রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি ছিল। সেন

আমলে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিতে উচ্চ বর্ণের লোক স্থান পেয়েছে, নিচু **শ্রেণীর মানুষ** হয়েছে অবহেলিত। তখন বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাষ্ট্র এতটুকুও অনুগ্রহ দেখায় নি। সেনযুগে রাষ্ট্র শাসনে **ব্রাহ্মণদের ও পুরোহিতদের প্রাধান্য** বেড়েছে। ধর্মে, সমাজে, সংস্কৃতিতে **মিলন ও সমন্বয়ের আদর্শ পরিত্যক্ত** হয়েছে।

পালযুগের বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম নানা আকার নিয়েছে। **মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান** ইত্যাদি নানা মত ও পথ বৌদ্ধধর্মে দেখা দিয়েছিল। এইসব মত ও পথে বুদ্ধপূজার সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর পূজাও চালু হয়েছিল। জপ, হোম, মন্ত্র, মুদ্রা বৌদ্ধ পূজা পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আচার আচরণে খুব বেশি তফাৎ থাকল না। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশে গেল। হিন্দু-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিলন **সহজিয়া ধর্মে** খুব স্পষ্ট। সহজিয়া ধর্মে বুদ্ধের চেয়েও গুরুকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। সহজিয়া ধর্মের মধ্যে সাধারণ মনুষ্যের **স্বাধীন চিন্তা, বিচার ও বুদ্ধি** প্রকাশ পেয়েছে। সহজিয়া পথের অনুগামীদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, "হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র।" সমাজের নিচু স্তরের মানুষের মধ্যে সহজিয়া ধর্ম খুব বেশি প্রসার লাভ করেছিল।

১০. পাল ও সেনযুগে শিক্ষার প্রসার সাহিত্য চর্চা

শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারে পাল ও সেন যুগের অতুলনীয় ভূমিকা ছিল। কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় পালযুগেই সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, ওদন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশিলা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়। সম্ভবত গোপাল ছিলেন ওদন্তপুরী বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষে সোমপুর বিহারের কিছু কিছু চিহ্ন মিলেছে। দেবপাল ছিলেন ত্রৈকূটক মঠ নামে এক বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা।

বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধর্মপাল। বর্তমান ভাগলপুরের কাছে গঙ্গাতীরে বিক্রমশিলা অবস্থিত ছিল। এখানে

১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। বুদ্ধজ্ঞানপাদ ছিলেন প্রধান আচার্য। অধ্যাপকদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্ণবর্ধন, প্রশান্ত মিত্র ও বুদ্ধশান্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়। পড়াশুনার যাবতীয় খরচ মহাবিহার বহন করত। কৃতী ছাত্রদের উপাধিপত্র দেওয়া হত। বিক্রমশিলার সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

মধ্যযুগের বাংলাদেশে **সংস্কৃত সাহিত্য** রচনায় বিশেষ রীতি মানা হত। এই রীতিকে বলা হত **গৌড় মার্গ** বা **গৌড় রীতি**। পালযুগে বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছিলেন **'রামচরিত'** কাব্য। এই কাব্যের বিষয় রামায়ণের রামচন্দ্র ও পাল-রাজা রামপাল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পালযুগে বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্যাপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির রচয়িতা ছিলেন ৮৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। **দোঁহা ও চর্যাপদগুলিই** হল বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। সেনযুগ ছিল বাংলাদেশে **সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ।** স্বয়ং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। অন্যান্য লেখক ও কবিদের মধ্যে হলায়ুধ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮. চালুক্য ও পল্লবদের শিল্পকীর্তি

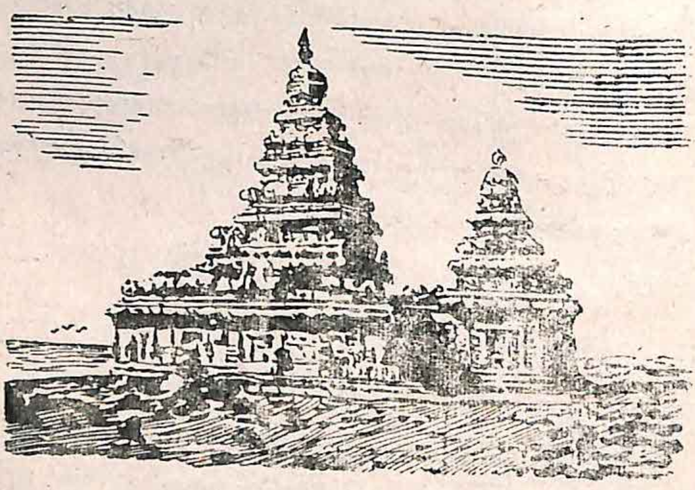
ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে **চালুক্যবংশীয়** রাজারা প্রাধান্য লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যভাগে বাদামি বা বাতাপি নগরে তারা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা নিজেদের **সূর্যবংশীয়** বলে দাবী করত। সম্ভবত তারা ছিল একটি স্থানীয় গোষ্ঠী। রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে বিবাদের পর তারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

চালুক্যবংশের প্রধান রাজা ছিলেন **দ্বিতীয় পুলকেশী**। সপ্তম শতকে তিনি হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন। তিনি দক্ষিণ মালব ও

গুজরাট জয় করেছিলেন এবং পাণ্ড্য, চের (কেরল) ও চোল রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পল্লভ রাজ মহেন্দ্র বর্মাকেও পরাজিত করেছিলেন এবং পারস্যের রাজা খসরুর সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। **এশিয়ার একজন শক্তিশালী** রাজা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। সম্ভবত ৬৪২ সালে পল্লভরাজের কাছে তিনি পরাজিত হন। শত্রুর আক্রমণে রাজধানী বাতাপিতে আগুন লাগে এবং স্বয়ং পুলকেশী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চালুক্যদের শিল্পকীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাদামির গুহা **মন্দিরগুলি** উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। **আইহোলের** গোলাকৃতি **দুর্গা মন্দির** শিল্পরীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অজন্তা গুহার বহু বিখ্যাত চিত্র চালুক্য আমলেই অঙ্কিত হয়েছিল।

পল্লভ : সমুদ্রগুপ্তের সময় **পল্লভরা** কাঞ্চীনগরীতে **শাসন** ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে



সমুদ্রতীরে মহাবলীপুরম মন্দির

পল্লভশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আনুমানিক ৬২৫ থেকে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পল্লভদের শ্রেষ্ঠ রাজা **নরসিংহ বর্মন** রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই পল্লভশক্তি চরম উন্নতি লাভ করে।

মহামল্লপুরম বা মহাবলীপুরম ছিল পল্লভরাজ্যের প্রধানকেন্দ্র। সেখানে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে পল্লভদের অতুলনীয় কীর্তি এখনও অম্লান হয়ে আছে। মহাবলীপুরমের বিখ্যাত মন্দিরটি প্রায় সমুদ্রবক্ষে নির্মিত। মহাভারতের নির্বাচিত গল্প নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে প্রস্তর-আলেখ্য 'সপ্তরথ'। এর প্রত্যেকটি এক একটি বিরাট শিলাখণ্ডে খোদিত হয়েছে। **"গঙ্গাবতরণ"** দৃশ্যে দেবদেবী, নরনারী, জীবজন্তু প্রভৃতির প্রতিকৃতি প্রায় জীবন্ত হয়ে আছে। **মহাবলীপুরম** সত্যই বিশ্বের এক পবিত্র **শিল্পতীর্থ**। কাঞ্চীর শৈব এ বৈষ্ণব মন্দিরগুলি স্তম্ভ ও তোরণশোভিত। এই স্তম্ভ ও তোরণগুলি পল্লভযুগের শিল্পকীর্তির মহিমা কীর্তন করেছে।

২৫. চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ

চোলরাজ্য ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চোল রাজ্য ছিল পল্লভদের অধীনে। নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। মহামহিম রাজারাজের (৯০১-১০১৮) রাজত্ব চোলদের গৌরবময় যুগ বলে স্বীকৃত। তাঁর বিপুল নৌবাহিনী ছিল। তিনি সিংহলের কিছু অংশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন, চের ও পাণ্ড্য রাজ্যকে পরাজিত করেন এবং পূর্ব-চালুক্যদের পরাজিত করে বেঙ্গি দখল করেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত **বৃহদীশ্বর মন্দির** তাঁকে অক্ষয় যশের অধিকারী করেছে।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৮-৪৩) ছিলেন রাজারাজের পুত্র। অনেকের মতে তিনি ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর আমলে চোল নৌ-বাহিনী বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ তিনি জয় করেছিলেন এবং সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যকে পরাভূত করেছিলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে মালয় ও যবদ্বীপ পর্যন্ত বহু অঞ্চল তাঁর প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল। বাংলায় প্রথম মহীপালকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন। **গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম** ছিল চোল স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজারাজ **নৌবাহিনীর** গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি

জানতেন যে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল যদি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে চোলরাজ্য মহাপরাক্রান্ত হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সিংহল ও মালদ্বীপ আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের পিছনে অন্য কারণও ছিল। কেরালা, সিংহল ও মালদ্বীপের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে প্রচুর ধনরত্ন জমা হয়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সময় পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য চলত। আরব বণিকরা ভারতবর্ষ থেকে বস্ত্র, মশলা ও দামী পাথর পশ্চিম এশিয়াতে নিয়ে যেত। আরব বণিকদের অনেকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী শহরগুলিতে বসবাস করা শুরু করেছিল। স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার করত এবং ব্যবসা চালাত। তারা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলত। তারা ব্যবসাসূত্রে প্রচুর টাকা পয়সা এদেশে আনত। তাই তাদেরকে সবাই খুব সম্মান করে চলত। রাজারাজ ভেবেছিলেন যে ঐ সমস্ত অঞ্চল দখল করতে পারলে আরব বণিকদের অর্থ চোল রাজ্যের সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।

দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। চীনের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত এই ব্যবসা প্রসারিত হয়েছিল। ভারতীয় বাণিজ্যতরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে চীনে পেঁছাত, আবার চীন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসত। এই বাণিজ্যপথের মাঝখানে অবস্থিত ছিল শ্রীবিজয় রাজ্য। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা ছিল শ্রীবিজয় রাজ্যের অন্তর্গত। শ্রীবিজয় রাজ্য নানাভাবে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলির যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। শ্রীবিজয় রাজ্যের বণিকরা ভেবেছিল যে ভারতীয় বণিকদের সরাতে পারলে, এই বাণিজ্য তাদের হস্তগত হবে। ভারতীয় বণিকরা রাজা রাজেন্দ্রর সাহায্য প্রার্থনা করে। রাজেন্দ্রর নৌবাহিনী শ্রীবিজয় রাজ্যকে পরাজিত করে। ভারতীয় বণিকদের অধিকাংশই ছিল চোল রাজ্যের অন্তর্গত। তাদের বাণিজ্য থেকে চোল রাজ্যের বিপুল আয় হত। এই কারণেই রাজেন্দ্র ভারতীয় বণিকদের সাহায্য করতে রণতরী পাঠিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। শ্বেত হূন কাদের বলা হয় ? কতদূর তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ?

২। তোরমান কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। মিহিরকুল কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। হূন আক্রমণের রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল আলোচনা কর।

৫। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। হর্ষবর্ধন কি কি নাটক লিখেছিলেন ?

৭। বাণভট্ট কে ছিলেন ? তাঁর কোন গ্রন্থে সে যুগের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৮। সকলোত্তরপথনাথ কাকে বলা হত ? কতদূর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ?

৯। কাশ্মীরে হিউয়ান-সাং কি দেখেছিলেন ?

১০। ভারতের কোন অঞ্চলকে ধর্মক্ষেত্র বলা হত ? গঙ্গানদী দেখে হিউয়ান-সাং কি মন্তব্য করেছেন ?

১১। মহারাষ্ট্রের মানুষদের সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি মতামত প্রকাশ করেছেন ?

১২। কনৌজের বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি বিবরণ দিয়েছেন ? তাঁর বক্তৃতা শুনে মহারাজ হর্ষ কি বলেছিলেন ?

১৩। প্রয়াগের কুম্ভমেলা সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি বিবরণ দিয়েছেন ? তিনি হর্ষের দান অগ্রাহ্য করেছিলেন কেন ?

১৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কত ছিল ? কোন কোন দেশ থেকে এখানে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসত ? এখানকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নাম কর ?

১৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে শিক্ষাদন করা হত ? সেখানকার তিনটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ কর। সেখানে কি কি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত ?

১৬। কনৌজ দখলের জন্য কোন তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ? কনৌজের অবস্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ।

১৭। অমোঘবর্ষ, ভোজ ও ধর্মপালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৮। অগ্নিকুলোদ্ভব কথাটির অর্থ কি ? অগ্নিকুলোদ্ভব রাজপুতবংশের পরিচয় দাও।

১৯। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কলহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২০। শশাঙ্ক কে ছিলেন ? তাঁর অবদান আলোচনা কর।

২১। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। গ্রামের জীবন কেমন ছিল? প্রধান শস্য কি কি চাষ হত? কারা নিজস্ব সংঘ গড়ে তুলেছিল?

২২। মধ্যযুগে বাঙালীর প্রধান খাদ্য কি ছিল? পুরুষ ও মেয়েদের পোশাক ও সাজসজ্জা কেমন ছিল? কি কি উৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল?

২৩। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি মন্তব্য করেছিলেন?

২৪। পাল যুগের বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম চর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২৫। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২৬। পাল ও সেন যুগে সাহিত্য সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২৭। দ্বিতীয় পুলকেশী কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। চালুক্যদের শিল্পকীর্তির উদাহরণ দাও।

২৮। নরসিংহ বর্মনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। পল্লভদের শিল্পকীর্তির মহিমা বর্ণনা কর।

২৯। প্রথম রাজেন্দ্র চোলকে কি চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যায়? তোমার মতামত আলোচনা কর।

৩০। রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয় রাজ্যের বিরুদ্ধে রণতরী পাঠিয়েছিলেন কেন? কারণগুলি বিশদভাবে আলোচনা কর।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। এইভাবে হূন অভিযানের ফলেই পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয় — আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে।

২। হিউয়ান-সাং বলেছিলেন যে — আমলে সম্রাটের ভূসম্পত্তিও রাজস্বের এক চতুর্থাংশ ব্যয় করা হত — চর্চায়।

৩। হিউয়ান-সাং-এর বিবরণে ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, — ততটা নয়।

৪। হিউয়ান-সাং-এর বিবরণে একথা স্পষ্ট ভারতে ধর্মে ধর্মে — ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে — ছিল।

হিউয়ান-সাং-এর প্রকৃতি — ছিল — অধ্যায়ন করা।

৬। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে রাজপুতরা — থেকে আগত বিদেশী উপজাতির —।

৭। এই সব রাজ্যের পরস্পর বিবাদের মধ্যে ভারতবর্ষের — সমাজের চেহারা স্পষ্ট।

৮। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় সামন্তরা খুব বড় বড় — গ্রহণ করত।

৯। মেয়েদের মধ্যে — প্রথা ছিল না বলেই মনে হয়।

১০। পালযুগের বাংলাদেশে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার — ছিল।

১১। পালযুগে বাংলাদেশে সামগ্রিক — জেগে ওঠে। এটাই পালযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ — ।

১২। এই সমন্বয় ও — বাঙালী — ভিত্তি।

১৩। সেন আমলে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিতে — বর্ণের লোক স্থান— পেয়েছে, মানুষ অবহেলিত।

১৪। সহজিয়া ধর্মের মধ্যে সাধারণ মানুষের — ও — প্রকাশ পেয়েছে।

১৫। দোঁহা ও চর্যাপদগুলিই হল বাংলাভাষার — নিদর্শন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ

১. মধ্য এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম

স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এখন আফগানিস্থান বলতে যে অঞ্চলকে বোঝান হয়, প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে তা ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিল। এই অঞ্চলে তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সেগুলির মধ্যে **কপিশ রাজ্য** ছিল অন্যতম। খৃস্টীয় সপ্তম শতকে কপিশের রাজধানীতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল প্রায় একশ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে দু'হাজার। কপিশের রাজা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৌদ্ধধর্মে প্রতি তিনি ছিলেন প্রগাঢ়ভাবে শ্রদ্ধাবান। কপিশে অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল। জৈন ও পাশুপত সম্প্রদায়ের লোকও সেখানে বাস করত।

কপিশ থেকে তিনটি গিরিপথ ছিল ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত। এগুলির মধ্যে বামিয়েন গিরিপথ সবচেয়ে চওড়া। সুগদ বা সগ্‌দিয়ানা, পারস্য, সমরকন্দ, বাহ্লীক প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকরা

ভারতবর্ষের পথে যাতায়াতের সময় কপিশ ও বামিয়েনে আশ্রয় নিত। এই কারণে ভারতীয় বণিকরা এই দুই অঞ্চলকে ভাল করে জানত। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে বামিয়েনের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বামিয়েনের রাজধানীতে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। সেগুলিতে সহস্রাধিক বৌদ্ধভিক্ষু বাস করত।

বামিয়েন উপত্যকায় **হিন্দুকুশ পর্বতের** ধারে অনেক প্রাচীন গুহামন্দির ছিল। এ সব গুহামন্দিরে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে। এগুলির ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত, লিপি ব্রাহ্মী। সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি কুশান যুগের। গুপ্তযুগেরও অনেক অনেক পুঁথি এসব গুহায় পাওয়া গেছে। বামিয়েনের গুহায় বিরাট বুদ্ধ মূর্তি ছিল। হিউয়ান-সাং যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে আমরা জানত পারি কয়েকটি মূর্তির উচ্চতা ছিল ৯০ ফুট থেকে ১৫০ ফুট। গুহাগাত্রে যে সব ছবি আঁকা আছে, সেগুলি একান্তই অজন্তার অনুকরণে সৃষ্ট। পণ্ডিতদের অনুমান গুহামন্দিরগুলি খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল।

বামিয়েন থেকে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করলে বাহ্লীক দেশে পৌছান যায়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়ান-সাং এদেশের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। তখন এদেশের রাজধানীর নাম ছিল **রাজগৃহপুর**। রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল। তিন হাজারের বেশি বৌদ্ধ-ভিক্ষু সেখানে বাস করত।

মধ্য এশিয়ায় খোটান ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে এ দেশের মানুষ খুবই সুসভ্য ছিল। তাদের বেশভূষা ও আচার ব্যবহার বেশ মার্জিত ছিল। তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। রাজধানীতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল একশ'র বেশি। সেখানে বাস করত পাঁচ হাজারের বেশি বৌদ্ধভিক্ষু। সে আমলে খোটানের বৌদ্ধভিক্ষুদের বিশ্বাস ছিল স্বয়ং বৈরোচন কাশ্মীর থেকে খোটানে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৈরোচন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবতা।

চীনদেশের সীমান্তে তুন-হোয়াং-এর পর্বতমালায় প্রায় ৫০০ গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল বৌদ্ধদের গুহামন্দির। এই গুহাগুলি **সহস্র বুদ্ধের গুহা** নামে পরিচিত। ৩০০ গুহা ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজানো। এই গুহাগুলি পড়াশুনা, আলোচনা ও ধ্যানের জন্য ব্যবহার করা হত। বাকী গুহাগুলিতে ভিক্ষুরা বসবাস করত।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে **মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম** জীবন্ত ছিল। কুচা, তুখার, তুর্ফান, খোটান, কাশগর প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধদের বসবাস ছিল। ভারতবর্ষ ও চীন থেকে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আনাগোনা ছিল এসব অঞ্চলে। স্থানীয় ভাষায় অনেক পুঁথির অনুবাদও হয়েছিল। অনেক পুরাতন ভাষার খোঁজ পাওয়া গেছে এই সব পুঁথিপত্রে। সুগ্দীয়, খোটানী, তুখার, কুচীয়, তুর্কী ও তিব্বতী প্রভৃতি ভাষার অনেকগুলিই আমাদের অজানা ছিল। এগুলির মধ্যে কোন কোন ভাষা বর্তমানে একেবারে লুপ্ত। এসব ভাষার মোটামুটি পরিচয় এখন জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মীলিপিতে পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল। ব্রাহ্মীলিপি ছিল গুপ্তলিপির এক বিশেষ ধারা। বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক পুঁথি সে সময় সংস্কৃত ভাষাতেও লেখা হয়েছিল।

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব চিত্র ও ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, সেগুলি নানা দেশের শিল্পীরা মিলে তৈরি করেছিল। শিল্পীদের মধ্যে কেউ ভারতীয় ছিলেন, কেউ বা ছিলেন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের, আবার পারসিক ও চীনা শিল্পীরাও ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম এইসব শিল্পীর প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ায় এক বিরাট সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল। ভারতীয়, গ্রীক, পারসিক, তুর্কী ও চীনা উপাদানে এই সভ্যতা তৈরি। **মহাযান বৌদ্ধধর্ম** ছিল এই **সভ্যতার** প্রাণশক্তি।

২. ভারত-চীন যোগাযোগ

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা চীনে যান। তাঁদের মধ্যে উজ্জয়িনীর পরমার্থ ও উপশূন্য, বারাণসীর গৌতম

প্রজ্ঞারুচি, মধ্য ভারতের গুণভদ্র, গান্ধারের জিনভদ্র, বাংলার জ্ঞানভদ্র দক্ষিণ ভারতের বোধিরুচি ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাকর সিংহ চীনে যান। মধ্য ভারতের বজ্রবোধি ও তাঁর শিষ্য অমোঘবজ্র চীনে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করেন। খ্রীস্টীয় দশম ও একাদশ শতকেও ভারতবর্ষ থেকে বিশেষত নালন্দা ও পশ্চিম ভারত থেকে কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে গিয়েছিলেন।

হিউয়ান-সাং চীনে ফিরে যাবার পর চীন সম্রাট লি ই-পিয়াও এবং ওয়াং হিউয়ান-সে এই দুইজনকে দূত হিসাবে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় পাঠান। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৬০[illegible]জন চীনা ভিক্ষু ভারতে আসেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কোরিয়াবাসী। সপ্তম শতকের শেষে ই-চিং নামে একজন বিখ্যাত চীনাভিক্ষু ভারতবর্ষে আসেন। তিনি নালন্দায় প্রায় দশ বছর পড়াশুনা করেছেন। ৭৯০ সালে বহু পুঁথি সঙ্গে নিয়ে চীনে ফিরে যান। ৯৬৪ সালে ৩০০ চীনা ভিক্ষু ভারতে তীর্থযাত্রা করতে আসেন। ১২ বছর পর তারা চীনে ফিরে যান। মধ্যযুগে ভারতযাত্রী শেষ চীনাভিক্ষু হচ্ছেন হুয়েই-ওয়েন। ১০৩১ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং ১০৩৯ সালে চীনে ফিরে যান। এই সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের নানা মতবাদ চীন দেশেও প্রসার লাভ করে। এই সব মতবাদ চীন থেকে কোরিয়া এবং কোরিয়া থেকে জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গীত, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, গুহামন্দির নির্মাণ পদ্ধতি, মূর্তিগঠন, চিত্রকলা এসব বিষয়ে ভারতীয় প্রভাব মধ্যযুগের চীনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

৩. তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম

মধ্যযুগেই ভারতের সঙ্গে তিব্বতের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিব্বতের রাজা স্রং সান গাম্পো হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি সংস্কৃত ও ভারতীয় লিপির চর্চাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পরে নানা ধর্মের সংমিশ্রণে তিব্বতী ধর্মাচরণ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম সাধারণভাবে

লামাবাদ বা **লামাধর্ম** নামে পরিচিত। সেখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেবার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে **লামাকেও** শরণ নেবার মন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে। এই কারণেই তিব্বতী বৌদ্ধধর্মকে লামাবাদ বা লামাধর্ম নামে অনেকে অভিহিত করেছেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানঃ তিব্বতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিক্রমশিলার বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে **অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম** চিরস্মরণীয়। তিনি বাঙালী ছিলেন। অনেকের অনুমান ৯৮০ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমপুরের (অধুনা বাংলাদেশে) বজ্রযোগিণী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তাঁর নিজের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি যাবতীয় **দর্শনশাস্ত্র** ও তন্ত্র-শাস্ত্রে বিপুল জ্ঞানলাভ করে-ছিলেন। ২৯ বছর বয়সে তিনি মগধের ওদন্তপুর বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তারপর তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধিতে পরিচিত হন। সুবর্ণ-দ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। পালরাজা মহীপালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশিলার প্রধান আচার্যপদ গ্রহণ করেন।


অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান
ডানদিকে ঃ জ্ঞানমঞ্জুষা, বাঁদিকে ঃ স্তূপ

তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ১০৩৮ খ্রীস্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি সেখানে **বিশুদ্ধ মহাযান** মত প্রচার করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তিব্বতেই ছিলেন। ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে লাসার নিকট সে থান মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন। অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে তিব্বতের লামা সম্প্রদায় শ্রদ্ধাভক্তিতে এখনো অভিভূত। বোধিসত্ত্ব রূপে অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি এখনো তাঁরা পূজা করেন। তিনি সংস্কৃত

ও তিব্বতী ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'বোধিপথ প্রদীপ' 'শরণাগতাদেশ' 'মহাত্মান-পথ-সাধন সংগ্রহ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সভ্যতার বিস্তার

স্মবর্ণভূমি ঃ ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মালয়, স্মমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও দ্বীপ সমষ্টি



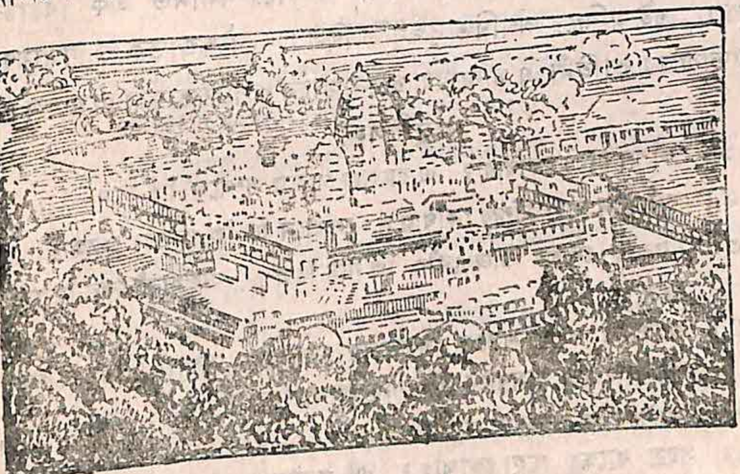
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংযোগ

এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলকে **স্মবর্ণভূমি** বলা হত। ভারতীয় বণিকরা বাংলা, কলিঙ্গ ও পূর্ব-উপকূলের বন্দর থেকে জলপথে যাতায়াত করত এই স্মবর্ণভূমিতে। কারণ সেখানে অনেক মশলা ও ধাতুদ্রব্য পাওয়া যেত। ক্রমশ ভারতীয়রা সেখানে বসবাস শুরু করে, তারপর উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যও স্থাপন করে। এসব অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার খুব সমাদর হয়েছিল। **ব্রাহ্মণ্যধর্ম**, বিশেষ করে শৈবধর্ম, ছড়িয়ে পড়েছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, আনাম, স্মমাত্রা,

জাভা, বোর্নিও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ঐতিহাসিকরা **বৃহত্তর ভারত** বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা এসব অঞ্চলে এতদূর ছড়িয়েছিল যে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এগুলি ভারতেরই অঙ্গ। বৃহত্তর ভারত কথাটির মধ্য দিয়ে এই ধারণাটাই বোঝান হয়েছে।

যশোধরপুর ও আঙ্কোর-ঠোম: আধুনিক যুগে ইন্দোচীন নামে যে জায়গা চিহ্নিত, সেখানে প্রাচীনকালে কম্বুজ রাজ্য ছিল। চীনারা এই অঞ্চলকে বলত ফু-নান। বহু অনুশাসন থেকে কম্বুজ রাজ্যের অনেক কীর্তিকাহিনী আমরা জানতে পেরেছি। জয়বর্মন, যশোবর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি কৃতী রাজা সেখানে রাজত্ব করেছেন। যশোবর্মনের সময় রাজধানী ছিল যশোধরপুর। যশোধরপুর বর্তমানে আঙ্কোর-ঠোম নামে পরিচিত। যশোধরপুর ছিল তখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম। নগরে প্রবেশপথে পাঁচটি তোরণ ছিল। নগরের মধ্যে বিরাট মন্দির ছিল। সেখানে শিবপূজা হত। মন্দিরটি তিনটি স্তরে নির্মিত, অনেকটা পিরামিডের মত। হিন্দুধর্মের নানা কাহিনী মন্দির গাত্রে খোদিত ছিল।

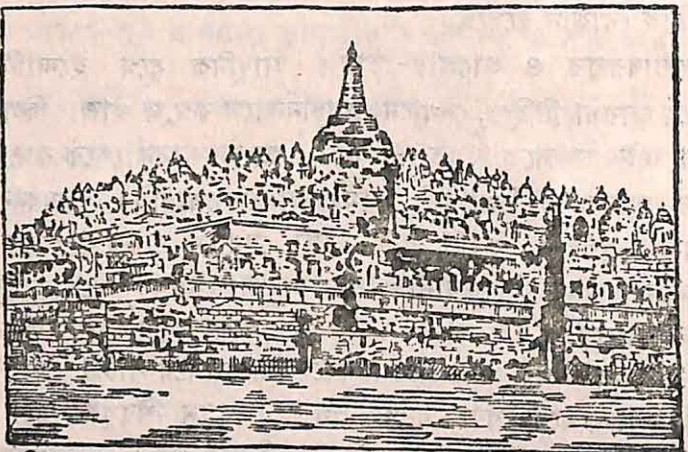
আঙ্কোর-ভাট: আঙ্কোর-ভাট ছিল একটি আশ্চর্য সুন্দর বিষ্ণু মন্দির। বিরাট এক সমতল বেদীর উপর এই মন্দির নির্মিত



আঙ্কোর-ভাট মন্দির

হয়েছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা সূর্যবর্মন। এই মন্দিরটি কম্বুজে ভারতীয় শিল্পের অনন্য নিদর্শন।

বরবুদুরের মন্দির : শৈলেন্দ্র বংশের শাসনে মালয় উপদ্বীপে ও জাভাতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ভক্ত। বরবুদুরের মন্দির শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। মন্দিরটি গিরিশিখরে অবস্থিত।



বরবুদুরের মন্দির

নয়টি থাকে নির্মিত। সবচেয়ে নিচের স্তরের দৈর্ঘ্য হল প্রায় ১৩১ গজ। সবচেয়ে উপরে আছে ঘণ্টার আকারে নির্মিত এক বিরাট স্তূপ। এই মন্দিরে অগণিত বুদ্ধমূর্তি ছিল। বৌদ্ধজাতক ও রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এ মন্দিরের স্থানে স্থানে রূপায়িত করা হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। কপিশ রাজ্য কোথায়? এ রাজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কি জান?

২। বামিয়েন গুহা মন্দির কোথায়? সেখানে কি কি পাওয়া গেছে?

৩। বাহ্লীক দেশের রাজধানীর কি নাম ছিল? রাজধানী কেন বিখ্যাত ছিল?

৪। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে খোটানের মানুষদের সম্পর্কে কি পরিচয় পাওয়া যায়? সেখানে কত বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল?

৫। খোটানে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন?

৬। সহস্র বুদ্ধের গুহা কোথায়? এই গুহাগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হত?

৭। মধ্য এশিয়ায় যে সব পুরাতন ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির উল্লেখ কর।

৮। মধ্য এশিয়ার যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে, সেগুলি কোন ভাষায় লিখিত? কোন লিপিতে লিখিত?

৯। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা কি উপাদানে তৈরি? কোথা থেকে এই সভ্যতা প্রাণশক্তি পেয়েছিল?

১০। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত যে সব ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়েছিলেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

১১। হিউয়েন-সাং-এর পর যে সব চীনা দূত ও চীনা ভিক্ষু ভারতে এসেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

১২। ভারত-চীন যোগাযোগের ফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।

১৩। স্রং সান গাম্পো কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৪। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মকে লামাবাদ বা লামাধর্ম বলা হয় কেন?

১৫। অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তিনি তিব্বতে কোন ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

১৬। কোন অঞ্চলকে সুবর্ণভূমি বলা হত?

১৭। বৃহত্তর ভারত কথাটির দ্বারা কি বোঝান হয়?

১৮। ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল কেন?

১৯। প্রাচীন যশোধরপুর নগরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২০। আংকোর ভাটের প্রতিষ্ঠাতার নাম কর। আংকোর ভাট বিখ্যাত কেন?

২১। বরবুদুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। মধ্য এশিয়ায় খোটান ছিল সবচেয়ে — দেশ।

২। বৈরোচন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের —।

৩। চীনদেশের সীমান্তে — পর্বতমালায় প্রায় ৫০০ গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে।

৪। খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে মধ্য এশিয়ায়— জীবন্ত ছিল।

৫। এই সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের নানা — চীন দেশেও প্রসার লাভ করে।

৬। — রূপে অতীশ দীপংকরের মূর্তি এখনো তাঁরা পূজা করেন।

৭। ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে — ছিল না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে — হয়ে আছে।

৮। — ছিল একটি আশ্চর্য সুন্দর বিষ্ণু মন্দির।

৯। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন — বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ভক্ত।

১০। — মন্দির শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী যুগ (খ্রীঃ ১২০৬-১৫২৬)

৭. তুর্ক-আফগান রাজত্বে ভারতবর্ষ

তুর্ক-আফগানদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন পর্যায় শুরু হল। ভারতে তুর্ক-আফগান শাসনের তারা ছিলেন অগ্রদূত। ভারতবর্ষে তুর্ক-আফগান শাসন শুধুমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যেই স্মরণীয় নয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুর্ক-আফগান আমলে ইসলামের সংস্পর্শে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের শাসন ছিল **দিল্লীকেন্দ্রিক**। আফগানিস্থান থেকে দিল্লী পৌঁছান সহজ। দিল্লী থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব। তুর্ক-আফগানদের দিল্লী-কেন্দ্রিক শাসনকাল ইতিহাসে দিল্লীর সুলতানী যুগ নামে পরিচিত।

সুলতানদের লক্ষ্য ঃ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার দিল্লীর সুলতানদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল। তাই তারা সুযোগ পেলেই ভারতবর্ষের নানা দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে, অভিযান চালিয়েছে



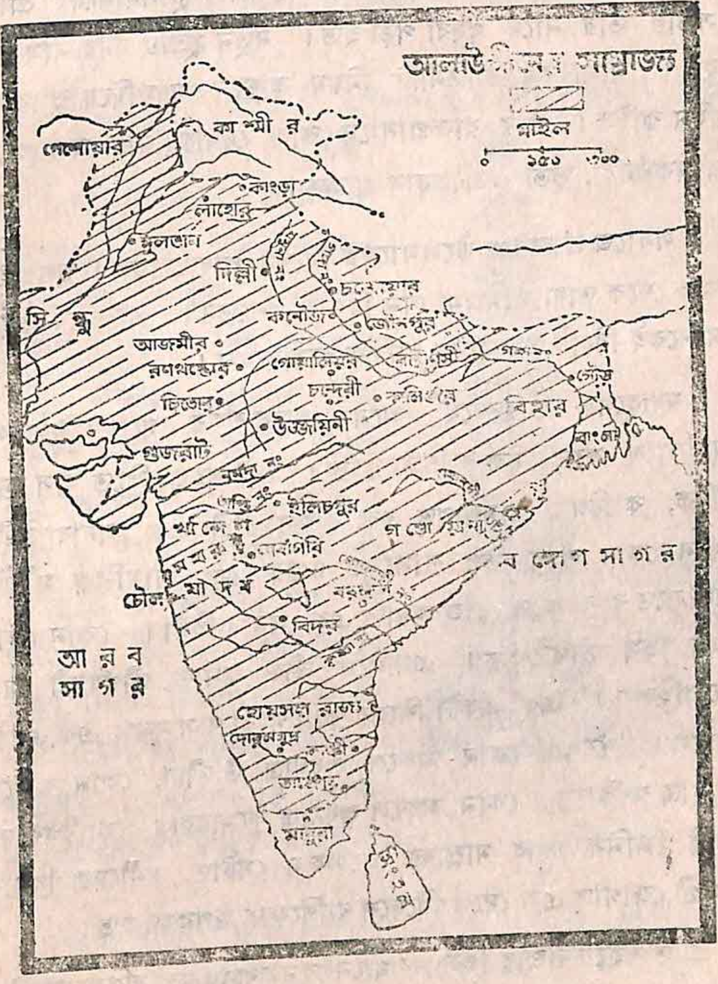
কুতুবুদ্দিন আইবক



আলাউদ্দিন খলজী

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী মারা যান। তাঁর সেনাপতি

কুতুবুদ্দিন আইবক তারপর সুলতান হন। এখন থেকে দিল্লীর সুলতানী রাজ্য নিছক আফগান রাজ্যের প্রসারিত অংশ নয়। দিল্লীর সুলতানী রাজত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বে দিল্লীর সুলতানী শাসন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।



তখন সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছে। স্বয়ং সুলতানও সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করেছেন। আলাউদ্দিন খলজী উলেমার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন এবং সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন। ফলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন ঃ দেশের শাসকরা ছিল সম্ভ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত। সুলতান, সামন্তবর্গ, হিন্দুরাজন্যবর্গ এবং জমিদাররা—এদের নিয়েই **সম্ভ্রান্ত** শ্রেণী গঠিত ছিল। দিল্লীতে রাজপ্রাসাদে মহা আড়ম্বর ও বিলাসে বাস করতেন স্বয়ং **সুলতান**। নতুন সুলতান সিংহাসনে বসলে প্রতি শুক্রবার মুসলমানদের প্রার্থনা সভায় তাঁর নামে খুদবা পড়া হত। নতুন মুদ্রায় তাঁর নাম ছাপা হত। নানারকম রীতিনীতি নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে সুলতানের দিন কাটত। তাঁর রাজপ্রাসাদে কাজ দেখাশোনার জন্য অনেক রাজকর্মচারী, ভৃত্য ও ক্রীতদাস থাকত।

সমাজে **ব্রাহ্মণ** ও **উলেমাদের** বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সুলতানের কাছ থেকে তারা জমিজমা দান হিসাবে পেতেন। এইভাবে তাঁদের অনেকেই বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

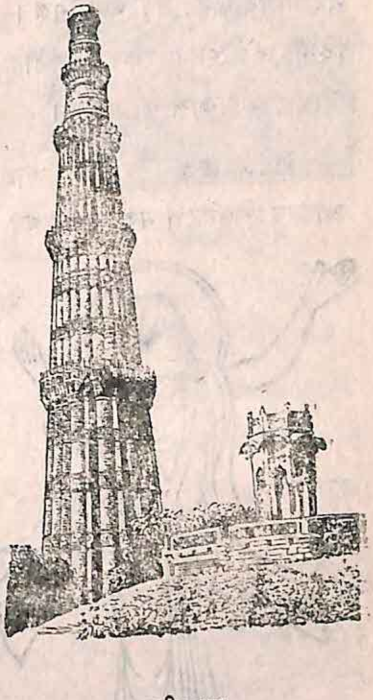
মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অনেক **নতুন শহর** গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ শহর ছিল **বাণিজ্য** কেন্দ্র। এই শহরগুলিতে বাস করত বণিক, কারিগর, সামন্তপ্রভু এবং রাজকর্মচারী এবং সেনাবাহিনী। কোন কোন শহর ছিল **শাসনের দপ্তর** এবং **সামরিক ঘাঁটি**। এগুলিতে বাস করত রাজকর্মচারী এবং সেনাবাহিনী। কোন কোন শহর ছিল **তীর্থক্ষেত্র**। এগুলিতে ভীড় জমাত তীর্থযাত্রী আর পুরোহিতরা। এক একটা শিল্পের কারিগররা বাস করত এক একটা অঞ্চলে। যেমন, কোন অঞ্চলে শুধুমাত্র তাঁতীরা, কোন অঞ্চলে শুধুমাত্র স্বর্ণকাররা, কোন অঞ্চলে শুধুমাত্র কুমোররা। কারিগরদের তৈরি জিনিস গরীব মানুষের প্রয়োজন মেটাত, ধনীদের বিলাস সামগ্রী জোগাত এবং দেশে বিদেশে বাণিজ্যের উপকরণ হত।

প্রতি শহরে বাজার ছিল। সেখানে কেনাবেচার জন্য বণিকদের ভীড় জমত। নানাস্থানে বড় বড় মেলা বসত। তখন দিল্লী ছিল একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত নগর। এখানে কনৌজ থেকে চিনি, পূর্বাঞ্চলের দেশ থেকে সাদা চাল, দোয়াব অঞ্চল থেকে গম, দক্ষিণ ভারত থেকে সূক্ষ্ম রেশম, সূতী বস্ত্র, হাতির দাঁত, অলঙ্কার আসত। আরব, পূর্ব আফ্রিকা, শ্রীবিজয়

ও চীন থেকে নানা জিনিস আসত। চীনের সঙ্গে বণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। ইলতুৎমিসের আমল থেকেই রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হয়। এগুলিকে বলা হত টঙ্কা। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু বণিকদের সংখ্যা ছিল বেশি।

গ্রামীণ জীবনে খুব বেশি পরিবর্তন আসে নি, কৃষকদের জীবনেও নয়। অনেক তুর্কী আমীর জায়গীর পেয়েছিল। কিন্তু চাষের কাজ করত অগণিত হিন্দু চাষী।

শিল্প সংস্কৃতির সমন্বয়ঃ সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। হিন্দু-মুসলমান সমাজের জীবনাচরণ পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বহু জায়গায় হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাংশ দিয়ে মস্‌জিদ নির্মিত হয়েছে। হিন্দুর শিল্প মুসলমানের পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ভাব-ধারার মিলনে অভিনব শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ রূপে দিল্লীর কুতুবমিনার, নিজামুদ্দিন আউ-লিয়ার মস্‌জিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ, গৌড়ের বড় সোনা মস্‌জিদ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।



কুতুবমিনার

ভক্তি আন্দোলনঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যেও সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বয়ের ফলে দুটি আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুটি আন্দোলন সুফী আন্দোলন ও ভক্তি-আন্দোলন নামে পরিচিত। সুফী আন্দোলনের মত ভক্তি আন্দোলনও জনপ্রিয় হয়েছিল। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুফী ও ভক্তি আন্দোলনের এটাই ছিল মূল কথা।

কবীর ঃ ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিন জনের নাম বিশেষ পরিচিত। তাঁরা হলেন কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক। বারাণসীতে কবীর একজন তাঁতীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। কবীর বলতেন যে মানুষে মানুষে তফাৎ নেই, ধর্মে ধর্মে তফাৎ নেই, আল্লা আর রামে প্রভেদ নেই। সব মানুষ এক, সব ধর্ম এক। সরল হিন্দীতে এসব কথা কবীর তাঁর দোঁহাতে প্রকাশ করেছেন।


কবীর

শ্রীচৈতন্য ঃ হোসেন শাহ যখন বাংলা দেশের সুলতান, তখন জ্ঞানের তীর্থরূপে নবদ্বীপের খুব হাঁকডাক। এই নবদ্বীপেই চৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁর বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মার নাম শচীদেবী। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিন তাঁর জন্ম। তিনি টোলের পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। তিনি সমাজের নিচু শ্রেণীর দিকে মন দিলেন। ভগবানের নাম শুনিয়ে এবং ভালবাসা দিয়ে তাদের আপন করে নিলেন। যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, যবন হরিদাস ছিলেন অন্যতম। ২৪ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। ৪৮ বছর বয়সে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম, বাংলা


শ্রীচৈতন্য

সাহিত্য ও গান চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে নবজীবন লাভ করেছিল।

নানক ঃ ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে নানক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মকে তিনি মানতে চান নি। হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ তিনি মানতে চান নি। তাঁর বাণী 'আদি গ্রন্থে' সংকলিত করা হয়েছে। তিনি শিখদের ধর্মগুরু ছিলেন। কিন্তু তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের ধর্ম আন্দোলনের পুরোধা।



নানক

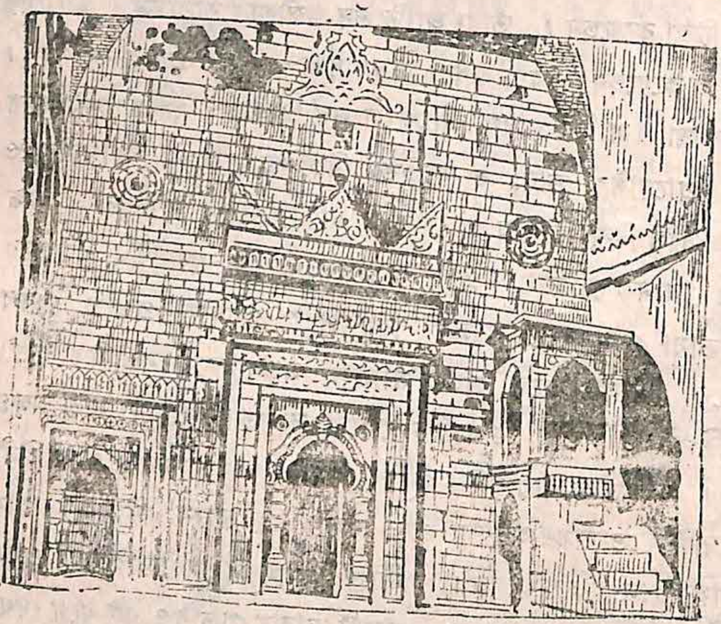
ভক্তি-আন্দোলন নিছক ধর্ম-আন্দোলন ছিল না। ধর্ম-আন্দোলনের নায়করা সমাজ সংস্কারের কথা চিন্তা করেছেন॥ তাঁরা জাতিভেদ অস্বীকার করেছেন। মানুষের জয়গান করেছেন। সবার উপরে মানুষ সত্য—একথা প্রচার করেছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব ঃ ধর্ম-আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। রামানন্দ ও কবীর সরল হিন্দী ভাষায় প্রচার কার্য চালিয়েছেন। হিন্দীভাষা সমৃদ্ধ হল। নানক যে ভাষায় প্রচার করেছেন, তা হল গুরুমুখী। পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রসারলাভ করল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনার ফলে বাংলা সাহিত্য নতুন রসে সঞ্জীবিত হল। উচ্চশিক্ষা ও গভীর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হল। কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফারসী ভাষার প্রভাবও এই যুগে দেখা গেছে। আমীর খসরু ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়। উর্দু ভাষা সৃষ্টিতে তাঁর অবদান কম ছিল না।

২. ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন

ইলিয়াস শাহ : ১৩৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। বাংলা ও বিহারের অনেক অঞ্চল তিনি অধিকার করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিহুত তিনি আক্রমণ করেছিলেন। কাশী পর্যন্ত তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলকের বিরুদ্ধে তিনি সফল হয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহের শাসনে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ছিল বাংলা দেশের সমাজ ও জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্যের বিকাশে তিনি উৎসাহী ছিলেন।

সিকন্দর শাহ : ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ (খ্রীঃ ১৩৫৭-৯৽) ছিলেন কৃতী শাসক। তাঁর আমলে দেশে শান্তি ছিল।



আদিনা মসজিদ

দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। তিনিও স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দিনঃ পরবর্তী শাসক ছিলেন সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন। গিয়াসুদ্দিন গৃহযুদ্ধে পিতাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি বাংলার শাসনকর্তা হন (খ্রীঃ ১৩৯৩-১৪১০)। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন কুশলী, সাহসী ও ন্যায়নিষ্ঠ। তিনি নিজে সুকবি ছিলেন। পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে তিনি পত্রবিনিময় করতেন। চীন দেশেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দিনের আমলে বাংলা দেশের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

ইলিয়াসশাহী রাজত্বের শেষ পর্বে হাবসী ক্রীতদাসরা প্রাধান্য অর্জন করে। হাবসী ক্রীতদাসরা এসেছিল আবিসীনিয়া থেকে। ১৪৮৬ থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত হাবসী সিদি বদর রাজত্ব করেছিলেন। সে সময় হাবসীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

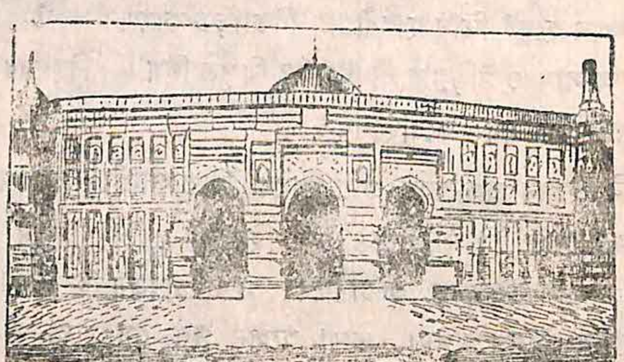
হুসেন শাহঃ হাবসীদের আমলে বাংলা দেশে অরাজকতা ছিল। তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুরোধে আলাউদ্দিন হুসেন বাংলার সুলতান হলেন (খ্রীঃ ১৪৯৩-১৫১৮)। তিনি ছিলেন সিদি বদরের মন্ত্রী। হুসেন শাহ নাম নিয়ে তিনি বাংলার সুলতান হয়েছিলেন।

সুলতান হয়েই তিনি হাবসীদের বিতাড়িত করলেন। তাঁর রাজ্য ত্রিপুরা, আসাম ও উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিহারের বেশ কিছু অংশ তিনি দখল করেছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী। বহু মসজিদ ও চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি দানে অকুণ্ঠ ছিলেন। তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে চারজন হিন্দু কর্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন **রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খান।** তাঁর উৎসাহে রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' রচনা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমদভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের জন্য হুসেন শাহ মালাধর বসুকে **'গুণরাজ খান'** উপাধি দেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সে সময় বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ

করেছিলেন। শোনা যায় হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি সত্যপীরের আরাধনার প্রচলন করেন। তিনি মনে করতেন মুসলমান সত্যপীর ও হিন্দু সত্যনারায়ণ এক ও অভিন্ন। সম্রাট অশোককে আমরা বড় রাজা বলে মানি, কারণ তিনি বৌদ্ধ হওয়া সত্বেও অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। হুসেন শাহকে আমরা বড় রাজা বলে জানি, কারণ তিনি মুসলমান হওয়া সত্বেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হুসেন শাহ ছিলেন গুণী রাজা। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলন ও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা দেশ সুলতানী আমলে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। এর কারণ হল বাংলাদেশ দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই দিল্লীর সুলতানরা খুব বেশি খবরদারী করতে পারত না। তাছাড়া বাংলা দেশ ও দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত ছিল খুব কষ্টসাধ্য। দিল্লীর সুলতানদের রাজকর্মচারীরা বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে পারত না।

বাংলা দেশ এই সময় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। চীনদেশের মিং সম্রাটরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনা বণিকদের



ছোট সোনা মসজিদ

পাঠিয়েছিলেন। ১৪২১ ও ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দে চেং-হো বাংলাদেশে এসেছিলেন। চীনা বণিকদের বিবরণে বাংলাদেশের আর্থিক অগ্রগতির স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের প্রধান

কৃতিত্ব হল হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানরা ছিল শাসক এবং হিন্দুরা ছিল শাসিত। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমান একত্রে পাশাপাশি বসবাস করেছে, মেলামেশা করেছে এবং একই জীবনধারায় সমবেতভাবে অংশ নিয়েছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা সমাদৃত ছিল। নবদ্বীপে ও অন্যান্য স্থানের টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি বিদ্যায়তনে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও দর্শনের চর্চা হত। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্যকীর্তিতে অতুলনীয় শিল্প কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে।

৩. সুলতানী শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমি রাজস্ব স্থির করা, আদায় করা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা—সুলতানী শাসন ব্যবস্থার এই তিনটি ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিছু জমি ছিল সুলতানদের জন্য সংরক্ষিত এবং সুলতানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই জমি থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যেত, তা ছিল সুলতানদের নিজস্ব আয়ের অন্তর্গত। এই ধরনের জমির রাজস্ব ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ। গ্রামে এবং জেলায় যেসব আঞ্চলিক রাজকর্মচারী ছিল, তারাই এই রাজস্ব আদায় করত। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সুলতানী আমলের আগে গ্রামের যে শাসন কাঠামো ছিল, সুলতানী শাসনে তা বিশেষ পালটায় নি। গ্রামের বংশানুক্রমিক প্রধানকে বলা হত মুকাদ্দম। পাটোয়ারি স্থানীয় দলিলপত্র সংরক্ষণ করত। মুশরিফ হিসাবপত্র তত্ত্বাবধান করত এবং রাজস্ব আদায় হলে তা দেখাশুনা করত।

রাজসভাতেও কিছু রাজকর্মচারী রাজস্বের হিসাব রাখত। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল ওয়াজির এবং বক্সী। রাজস্ব আদায় হলে ওয়াজির ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা হিসাব পরীক্ষা করে দেখত এবং সুলতানের দানের বিবরণ লিখে রাখত। আরও নানা ধরনের কর্মচারী ছিল। কেউ সেনাবিভাগের তত্ত্বাবধান করত। সুলতানের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের সম্পর্ক দেখাশোনার জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী

ছিল। প্রধান কাজী ছিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি ধর্মবিষয়ের নির্দেশ দিতেন। সমস্ত রাজকর্মচারীর উপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল ওয়াজিরের। তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করত সম্রাটের কৃতিত্ব। সর্বদাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন সুলতান স্বয়ং।

অনুশীলনী

১। দিল্লীর সুলতানী যুগ বলতে কি বোঝান হয় ?
২। তুর্ক-আফগান যুগে সুলতানদের ভারত অভিযানের কি লক্ষ্য ছিল ?
৩। সুলতানী যুগের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪। সুলতানী যুগের অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫। সুলতানী যুগের সমাজ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। মধ্যযুগের শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল, তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৭। সূফী ও ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা কি ছিল ?
৮। কবীর কে ছিলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৯। শ্রীচৈতন্য কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১০। নানক কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১১। ভাষা ও সাহিত্যের উপর ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচন কর।
১২। ইলিয়াস শাহ কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১৩। আদিনা মসজিদ কার আমলে নির্মিত হয়েছিল ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?
১৪। গিয়াসুদ্দিন কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১৫। মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে হুসেন শাহের অবদান আলোচনা কর।
১৬। সুলতানী শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?
১৭। সুলতানী আমলে বাংলা কেন স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল ?
১৮। মুকাদ্দম, পাটোয়ারি, মুশরিফ, ওয়াজির ও বক্সী ও প্রধান কাজী—এই সমস্ত কর্মচারীর কার কি দায়িত্ব ছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুর্ক-আফগান আমলে — সংস্পর্শে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল।
২। সুলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব — ঘটেছিল।
৩। ধর্ম আন্দোলনের নায়করা — সংস্কারের কথা চিন্তা করেছেন।
৪। বাংলাদেশের মুসলমান শাসনের প্রধান — হল — সম্প্রাতি।
৫। সর্বদাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন — স্বয়ং।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক)

১. কনস্টানটিনোপলের পতন ও নবজাগরণ

মধ্যযুগের ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্র। আধুনিক যুগের ভিত্তি হল ধনিকতন্ত্র। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনিকতন্ত্রে সমাজের পরিবর্তন অকস্মাৎ ঘটেনি। পরিবর্তন আসতে সময় লেগেছে প্রায় তিনি শ' বছর। তারিখের হিসাবে চৌদ্দ থেকে সতেরো শতক। সহজে বোঝার জন্য ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনেছেন। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ হল সেই সীমারেখা। ঐ সালে অটোমান তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্টানটিনোপল আক্রমণ করেছিলেন। কনস্টানটিনোপলের গ্রীক সম্রাট যুদ্ধে নিহত হলেন। কনস্টানটি-নোপলের পতন ঘটল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অবসান হল। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতরা কনস্টানটিনোপল ছেড়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের উৎসাহে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা ছড়িয়ে পড়ল। এ সব কারণে ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে ১৪৫৩ সালকে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরু হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ শুরু হল। ইটালীতে পেটার্ক ও বোকাশিও-এর সাহিত্যে নবজাগরণের প্রথম অভ্যুদয় লক্ষ্য করা যায়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন শিল্পী ও বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন নবজাগরণের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ইংলণ্ডে শেকসপীয়ারের সাহিত্যে এবং তার কিছু পরে ফ্রান্সের সাহিত্যেও নবজাগরণের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের বিদ্যাগুলি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেল। হারানো পুঁথির সন্ধানে মানুষ সচেষ্ট হল। নিজের ভাষায় ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করার উদ্যম দেখা দিল।

ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া ও গৃহনির্মাণেও শিল্পী ও স্থপতিরা নতুন বিষয়বস্তু, নতুন রীতি প্রবর্তন করল। মধ্যযুগের পুরোহিতরা ছিল

অলস ও দুর্নীতিগ্রস্থ। মধ্যযুগের ব্যারণ ও নাইটরা ছিল অকর্মণ্য ও অশিক্ষিত। মধ্যযুগের মানুষ শুধুমাত্র ধর্মতত্ব আর স্বর্গরাজ্য নিয়ে চিন্তা করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষের কাছে স্বর্গরাজ্য বড় নয়, এই পৃথিবী অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আধুনিক যুগের মানুষের কাছে সাফল্য বড় কথা। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, উত্তম ও পরিশ্রম আধুনিক মানুষের চারিত্রিক গুণ। তাই আধুনিক মানুষ নতুন বিত্থার দিকে মনোনিবেশ করল। সেগুলি হল ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প। স্বর্গের দেবতা নয়, মর্ত্যের মানুষ হল নবজাগরণের মূল মন্ত্র। তাই নবজাগরণের পণ্ডিত-দের নামকরণ করা হয়েছে হিউম্যানিস্ট বা মানবতন্ত্রী।

মধ্যযুগের মানুষের কাছে বিশ্বাসই ছিল জ্ঞানলাভের উপায়। আধুনিক মানুষের কাছে জ্ঞানলাভের পথ হচ্ছে যুক্তি তর্কবিচার। চোখ মেলে দেখা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝা এই হল আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক শর্ত। নবজাগরণ পর্ব নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মুখর। বন্দুক ও কামানে বারুদের ব্যবহার শুরু হল। যুদ্ধের প্রকৃতিও তাই পালটে গেল। দিগদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কারে দূরে বহুদূরে সমুদ্র যাত্রা সহজ হল। কাগজ ও ছাপাখানার প্রচলনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়ল। কোপারনিকাস জানালেন পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ব্রুনো বললেন সূর্য ও নানা গ্রহ বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলের অতি সামান্য অংশ। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তথ্য জানালেন। মানুষের শরীরে রক্ত-চলাচলের নিয়মের কথা হার্ভে শোনালেন। নতুন যুগের প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানচর্চায় নতুন প্রেরণা এল।

কনস্টানটিনোপলের পতনের পর তুর্কীদের আধিপত্য বেড়ে গেল। তখন স্থলপথে দেশবিদেশে বাণিজ্য চালান আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই বাণিজ্যের স্বার্থে জলপথের সন্ধানে ইউরোপের বণিকরা মেতে উঠল। স্পেনের রাজার অনুগ্রহে কলম্বাস ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্যে সাগর পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার

করলেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগালের প্রতিনিধি ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছালেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকূলে পর্তুগীজ বণিক ও আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের লোকেরা সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড এ সব নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল নাবিকদের দুঃসাহস, বণিকদের অর্থসাহায্য এবং রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে।

২. আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পত্তন

মধ্যযুগে রাজা ছিলেন সামন্তদের প্রধান। আধুনিক যুগে রাজা হলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নায়ক। কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রয়োজনে দেখা দিল অবাধ রাজতন্ত্র। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি প্রথমে দেখা দিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে, স্পেন ও পর্তুগালে, পরে প্রাশিয়া ও রাশিয়ায়। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনে দেখা দিল নেশন ও জাতীয়তাবোধের ধারণা। মধ্যযুগের পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কল্পনা বিলীন হয়ে গেল। তার জায়গায় দেখা দিল স্বদেশ ও স্বাদেশিকতার ধারণা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব শুরু হল। অধীনস্থ দেশগুলিতে শুরু হল মুক্তি আন্দোলন। ইউরোপীয় বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ঘটল। বিশ্বজোড়া বাণিজ্য গড়ে উঠল। অনুন্নত দেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ গড়ে উঠল। উপনিবেশে বাজার দখল নিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধবিগ্রহ বেঁধে গেল।

মধ্যযুগের অবসানে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ল। আধুনিক যুগের আবির্ভাবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন হল। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার রূপান্তর খুব সহজে ঘটে নি। অশান্তি, অরাজকতা, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসেছে। ১৩৫৮ সালে ফ্রান্সের প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করে। ১৩৮১ সালে ইংলণ্ডের কৃষকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের নেতা ছিলেন ওয়াট টাইলার। পনেরো শতকের শেষ থেকে জারমানির চাষীরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়েছে। চৌদ্দ শতকে বেলজিয়ামের

ফ্লাণ্ডার্স প্রদেশে মালিক ও কারিগরদের মধ্যে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ হয়েছে। ১৩৭৮ সালের ফ্লোরেন্সের চিয়ম্পি বিদ্রোহ কারিগরদের সংগ্রাম। পুরাতন ও নতুন সমাজের দ্বন্দ্ব ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশে অনেক দিন ধরে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বেঁধেছিল। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে পুরাতন যুগের বিদায় ও নতুন যুগের আগমনী ধ্বনিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। ১৪৫৩ সালকে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরু হিসাবে কেন চিহ্নিত করা হয়?

২। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রস্তাব আলোচনা কর।

৩। মধ্যযুগের মানুষ ও আধুনিক যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ আলোচনা কর।

৪। হিউম্যানিস্ট কাদের বলা হয়? কেন বলা হয়?

৫। নবজাগরণ পর্বের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উল্লেখ কর।

৬। নবজাগরণ পর্বের কয়েকটি ভৌগোলিক আবিষ্কার উল্লেখ কর।

৭। ইউরোপে কি ভাবে নেশন বা জাতীয়তাবোধের ধারণা গড়ে উঠেছিল?

৮। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কেন যুদ্ধ বিগ্রহ বেঁধে গেল? নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের রূপান্তর কেন সহজে ঘটে নি?

৯। মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব বিদ্রোহ ঘটেছিল, সেগুলির কয়েকটির বিবরণ দাও।

১০। মধ্যযুগের অবসানে ইংলণ্ডে কি ধরনের বিদ্রোহ ঘটেছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। মধ্যযুগের মানুষ একমাত্র — আর — নিয়ে চিন্তা করেছে।

২। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষের কাছে — বড় নয়, এই — অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

৩। স্বর্গের দেবতা নয়, মর্ত্যের — হল নবজাগরণের মূল মন্ত্র।

৪। মধ্যযুগের মানুষের কাছে — ছিল জ্ঞানলাভের উপায়।

৫। আধুনিক মানুষের কাছে জ্ঞানলাভের পথ হচ্ছে —।

৬। ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল নাবিকদের —, বণিকদের — এবং রাজাদের প্রভাব — ফলে।

৭। কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রয়োজনে দেখা — দিল রাজতন্ত্র।

নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী

খ্রীস্টাব্দ ৪৭৬ রোম সাম্রাজ্যের পতন

,, ৪৯৫ হুন নায়ক তোরমান কর্তৃক পাঞ্জাব রাজ্য প্রতিষ্ঠা

,, ৫০০ আনুমানিক এই সময়ে জাপান কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল

,, ৫৩০ মালবরাজ যশোবর্মন হুনদের পরাজিত করেন

,, ৫২৭-৫৬৫ সম্রাট জাসটিনিয়ানের রাজত্বকাল

,, ৫৭০-৬৩২ হজরত মহম্মদের জীবনকাল

,, ৬০৫-৬১০ চীনের বিরাট খাল খনন

,, ৬০৫ এই সময়ের কিছু পূর্বে বাংলাদেশের প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা

,, ৬২২ হিজরী বর্ষ গণনা শুরু

,, ৬২৫-৬৪৫ পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকাল

,, ৬২৯ চীন থেকে হিউয়ানসাং-এর ভারত অভিমুখে যাত্রা

,, ৬৩০-৬৪৪ হিউয়ান সাং-এর ভারতে অবস্থান

,, ৬৩৪ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হর্ষবর্ধনের পরাজয়

,, ৬৪২ পল্লভরাজ নরসিংহ বর্মনের নিকট দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাজয়

,, ৭১১ আরবদের (মুরদের) স্পেন দখল

,, ৭৩২ চার্লস মারটেলের নেতৃত্বে ফ্রাঙ্করা তুর্সের যুদ্ধে আরবদের পরাজিত করে

,, ৭৫২ চার্লস মারটেলের পুত্র পিপ্পিন দি শর্ট ফ্রাঙ্কদের রাজা হন

,, এবং ক্যারোলিনজিয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন

,, ৭৭১-৮১৪ মহামতি চার্লস বা শার্লামেনের রাজত্বকাল

,, ৮০০ শার্লামেনের অভিষেক, পবিত্র 'রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

,, ৭৭০-৮১০ ধর্মপালের রাজত্বকাল

খ্রীস্টাব্দ ৮১০-৮৫০ দেবপালের রাজত্বকাল

,, ৮১৫-৮৭৭ রাষ্ট্রকুটবংশীয় অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল

,, ১০০০ ইটালীর নগরগুলির স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আবির্ভাব

,, ১২০৬ কুতুবউদ্দীন কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন লাভ

,, ১২৭১ -১২৯৫ মার্কো পোলোর ভ্রমণকাল

,, ১২৯৬-১৩১৬ সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল

,, ১৪৫৩ কনস্‌টানটিনোপল অটোমান তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত

,, ১৪৮৫-১৫৩৩ শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল

,, ১৪৯২ কলম্বাসের প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার

,, ১৪৯৩-১৫১৮ হুসেন শাহের রাজত্ব কাল

,, ১৪৯৮ ভাসকো-দা-গামা কর্তৃক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

অতিরিক্ত অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

ঠিক উত্তরটি √ এই চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ভুল উত্তরে × এই চিহ্ন দাও।

১। রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল যীশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় দুইশত/পাঁচ শত/একহাজার বৎসর পরে।

২। কনস্টানটিনোপলের পতন হয়েছে ১৪৫৩/১৫১৭/১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ভসিগথদের প্রধান নেতা ছিলেন—এটিলা/গেইসারিক/আলারিক।

২। কৃষ্ণসাগরের সীমান্তে থাকত নর্সম্যান ডেনস/জুটস্/অসট্রোগথ/ভিসিগথ/লমবার্ড/এঙ্গেলরা।

৩। ওডোসার জুলিয়াস সীজারকে/কনস্টানটাইনকে/রমুলাস অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১। সম্রাট কনস্টানটাইন / সম্রাট জাসটিনিয়ান / রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত।

২। গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগৎবাসী পেয়েছে, চীনের/ভারতবর্ষের/বাইজানটিয়ামের কাছ থেকে।

৩। কনস্টানটিনোপলের সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন কনস্টানটাইন/জাসটিনিয়ান।

পঞ্চম অধ্যায়

১। আরবের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর তারা বেদুইন/ইরানী বলে পরিচিত।

২। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদ মদিনা যাত্রা করেছিলেন এই বছর থেকেই মুসলমানদের নতুন বছর হিজরী সন/শকাব্দ গণনা করা হয়।

৩। হজরত মহম্মদের পর প্রথম খলিফা হন ওসমান/ওমর/আবু বকর।

৪। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল, মক্কা/দামাস্কাস/বোগদাদ।

৫। দশমিক সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার আরব শিখেছে ইউরোপের/ভারতবর্ষের কাছ থেকে।

৬। বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে রোমান/আরবী লিপি ও উর্দু/পারসিক ভাষাকে আশ্রয় করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে চার্লস মারটেল/পিপ্পিন দি শর্ট/শার্লামেন তুর্সের যুদ্ধে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন।

২ শার্লামেনের রাজপ্রাসাদের স্কুলে স্পেন থেকে এসেছিলেন এলকুইন নরদামব্রিয়া থেকে কবি থিওডুলফ ও ইটালী থেকে পল দ্য ডিকন।

৩। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—কোন বিশেষ দেশের নিজস্ব জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

৪। মধ্যযুগের ইউরোপে লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল ইংরেজী/ফরাসী/ল্যাটিন/গ্রীক ভাষা।

সপ্তম অধ্যায়

১। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামো এই আনুগত্যের সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়েছিল। এই আনুগত্য রাষ্ট্রের/ব্যক্তির প্রতি।

২। সার্ফপ্রথা ছিল নির্বাচনমূলক/বংশানুক্রমিক।

৩। চার্চকে সার্ফরা যে কর দিত তাকে ক্যাপিটেশন/টাইথ/হেরিয়ট/টেইলী বলা হত।

৪। সার্ফকে সামন্তপ্রভু বিক্রি করতে পারত, অপরাধ করলে শাস্তি দিতে পারত, এমনকি খুনও করতে পারত।

৫। যে সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার নাইটদের মেনে চলতে হত, এগুলিকে এক কথায় বলা হত ক্রবাদুর/হিরোইজম/শিভ্যালরি।

অষ্টম অধ্যায়

১। ইউরোপের খ্রীস্টানরা চীনাদের/মোঙ্গলদের/মুসলমান সেলজুক তুর্কীদের কবল থেকে প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রায় দুশো বছর সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই সামরিক অভিযানগুলি ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত।

২। ফরাসীদের/গ্রীকদের/মুসলমানদের কাছ থেকে ইটালীর বণিক পরিবারের লোকজন ব্যাঙ্কের রীতিনীতি শিখেছিল।

নবম অধ্যায়

১। নিজের জমিজমা ও সম্পত্তি হস্তান্তর করার (অর্থাৎ বিক্রি করার, দান করার, লিজ দেবার) অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল শহরবাসীর। তাদের নানা ধরনের সামন্ত প্রথার কর দিতে হত।

২। অপরাধীদের বিচার হত স্থানীয়/সামন্তপ্রভুদের আদালতে।

৩। বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ছিল বণিকরা/কারিগর মালিকরা/জমির মালিকরা/ ব্যাঙ্কের অংশীদাররা।

দশম অধ্যায়

ক

১। থাং যুগে চীনে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত রাজার খেয়ালখুশী মত/ জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে।

২। সুং যুগে চিত্রশিল্পীদের প্রিয় বিষয় ছিল মানুষ/প্রকৃতি।

৩। তিব্বতে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের এক বিচিত্র সমন্বয়/গভীর বিরোধ গড়ে ওঠে।

৪। মার্কো পোলোর গ্রন্থ থেকে একথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে চীন নানা দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে নিকৃষ্ট/শ্রেষ্ঠ ছিল।

খ

১। জাপানের সাধারণ মানুষও ভারতে/কোরিয়ার/সুমাত্রার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে।

২। বংশানুক্রমিক সামরিক শাসনকে বলা হত মিকাডো / সিনটে / শোগানেট।
৩। পরে সমগ্র সামরিক শ্রেণী বোঝাতে দাইমিও/সামুরাই ব্যবহার করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

১। ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে হুন নেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করেন গুপ্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত/মান্দসরের যশোধর্মন।
২। 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' এই তিনটি নাটক রচনা করেন কবি বানভট্ট/হর্ষবর্ধন।
৩। হিউয়ান সাং-এর বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে ধর্মে ধর্মে মৈত্রী/বিরোধ ছিল না।
৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার খুব সহজ/কঠিন ছিল না।
৫। রাজপুতরা নিজেদের ব্রাহ্মণ/ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে।
৬। কর্ণসুবর্ণ হল চট্টগ্রাম/মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকট কানসোনা গ্রাম।
৭। পালযুগে বাঙালীরা ভারতীয় চেতনা লাভ করেছিল/করে নি।
৮। পালযুগ/সেনযুগ ছিল বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। বাহলীক! দেশে/খোটানে/তুন-হোয়াং পর্বতমালায় যে বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি সহস্র বুদ্ধের গুহা নামে পরিচিত।
২। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বিশুদ্ধ হীনযান/মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন।
৩। ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল/ছিল না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।
৪। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের/মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ভক্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। আলাউদ্দিন খলজী উলেমার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন/করতে পারেন নি এবং সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন / করতে পারেন নি।

২। সুলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে ছিল/ঘটেনি।

৩। সুফী আন্দোলন ও ভক্তি আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল/ঘটেনি।

বিশেষ অনুশীলনী

১। কল্পনা করো খ্রীস্ট্রায় নবম শতকে তুমি বিশ্বভ্রমণ করতে বেরিয়েছ। চীন, পশ্চিম এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপ তোমার ভ্রমণ তালিকায় ছিল। সে সব দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাস, প্রাসাদসৌধ ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি বর্ণনা করে বন্ধুকে একটি চিঠি দাও। চীন ও আরবদেশে তুমি কী কী জিনিস কিনেছিলে, তাও লিখবে।

২। প্রাচীনযুগ না মধ্যযুগ—কোন যুগের আকর্ষণ তোমার কাছে বেশি? কারণগুলি আলোচনা করে বন্ধুকে একটি চিঠি পাঠাও।

৩। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচ্যদেশগুলি থেকে কী কী শিখেছিল, তার বর্ণনা দাও।

৪। সামন্তপ্রভু, সার্ফ, নাইট, খ্রীস্টান সন্ন্যাসী এবং স্বাধীন মানুষ (অর্থাৎ ক্রীতদাস নয়)—মধ্যযুগের এসব মানুষদের কার জীবনযাত্রা তোমার কাছে বেশি কাম্য? এ বিষয়ে তোমার মতামত আলোচনা কর।

৫। মধ্যযুগে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, সে সব অঞ্চলে প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ সভ্যতার উদয় হয়েছিল?

৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগুলির পরিচয় দাও :—
আলরিক, গেইসারিক, এটিলা, ঈটাশ পোপ লিও, ওডেসার, রমুলাস অগাস্টাস জেনো, উলফিলাস, ক্যাসিওডোরাস, থিওডোরা, প্রেকোপিয়াস, মোয়াবিয়া, ইবন সিনা, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসি, আভেরস, চার্লস মারটেল, এলকুইন, পল দ্য ডিকন, থিওডুলফ, আইনহার্ড, সেণ্ট বেনেডিক্ট, এবেলার্ড, টমাস, একুইনাস, হিউয়ান-সাং, ওয়াং আন-শি, চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ, মার্কো পোলো।

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলির পরিচয় দাও ঃ
কানস্টানটিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, আন্তিয়োক, কর্ডোভা, বাল্‌ক কপিশ, গান্ধার, কিয়োতো, শ্রী বিজয়রাজ্য, পাণ্ডুয়া।

৮। নিম্নলিখিত সাহিত্য কীর্তির পরিচয় দাও ঃ
স্থ কোডেক্স, আরব্য রজনী, রুবায়েৎ, শাহনামা, গৌড়ী রীতি, রামচরিত, দোঁহা ও চর্যাপদ, আদি গ্রন্থ, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব।

৯। নিম্নলিখিত শিল্পকীর্তির পরিচয় দাও ঃ
'ক্যাথিড্রাল অব দি হোলি উইসডম', ব্যাসিলিকা অব সেণ্ট পো[illegible] নেয়ার,' চার্চ অব সেণ্ট ভিটেল,' মাউণ্ট আথোস, মহাবলি[illegible] ব্যামিয়েনের গুহায় বুদ্ধমূর্তি,' সহস্র বুদ্ধের গুহা, আঙ্কোর-ঠোম, আঙ্কোর-ভাট, বরবুদুরের মন্দির, কুতুব মিনার।

১০। নিম্নলিখিত গুলি সম্পর্কে যা জান লিখ ঃ
সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ, ত্রুবাদুর, চিন-শি, হং, ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়, কোশ সম্প্রদায়, বিনয় সম্প্রদায়, রিৎসু রীও, মিকাডো, সিনটো, বুশিদো, রত্নসাগর, মুকাদ্দম, পাটোয়ারি, মুশরিফ, ওয়াজির, বকসী, হিউম্যানিস্ট।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road